শাহজাদা শুজা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

যেথায় তুমি দেখতে পাবে
লাল গোলাপের রঙ-বাহার
জানবে সেথায় ঝরেছিল
রুধির কোন শাহানশার।
নার্গিস আর গুল-বনোসার
দেখবে যেথায় পাপড়ি নীল
ঘুমিয়ে আছে সুন্দরী এক
গালে আঁকা ছোট্ট তিল।

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর ভাব অবলম্বনে।

॥ এক ॥

পাথরের মত নিরেট অন্ধকারের বুকে দমকে দমকে আছড়ে পড়ছে চৈত্র শেষের উদ্দাম হাওয়া। সারাদিনের তপ্ত পৃথিবীটা এখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

অনেক রাত অবধি রোশনাই চলেছিল। আলোর রাশি রাশি ফুল ফুটছিল আকাশে। এখন প্রায় সব বাতিই নিভে গেছে। অতিরিক্ত হুল্লোড় আর মাত্রাছাড়া মাদক সেবনের ফলে প্রাসাদের প্রহরীরাও লুটিয়ে পড়ে আছে স্বস্থানে।

লাহোরের রঙমহলে সম্রাট শাজাহান শুরু করেছিলেন প্রতি ঋতুতে ফুলের উৎসব। উৎসবের শেষে চোখ জুড়ানো রোশনাই।

পিতার প্রচলিত সেই ঋতু-উৎসবটি বাংলার সুবাদার শুজাও শুরু করেছেন তাঁর রাজধানী রাজমহলে।

আজ ছিল ঋতুপতি বসন্তের উৎসব। প্রাসাদ থেকে অল্প কিছু দূরে ছোট্ট একটি বনে ঘেরা গঙ্গার তীরে শুজার নবনির্মিত হারেম। উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হয়েছে কাঠের দ্বিতল ঘরগুলি। মাথায় পরিচ্ছন্ন খড়ের ছাউনি। প্রান্তর জুড়ে উদ্যান। অশোক, পলাশ, কিংশুক পাগল হয়ে মেতেছে ফুল ফোটানোর খেলায়।

ঐসব ফুলেই আজ সাজান হয়েছিল হারেমের প্রতিটি কক্ষ। হারেম সংলগ্ন প্রান্তরে তৈরী হয়েছিল মণ্ডপ। বাংলার শ্রেষ্ঠ মালাকারেরা বাঁশ আব খড়ের তৈরী ঐ মণ্ডপকে লতা আর ফুলে মালঞ্চের রূপ দিয়েছিল। মণ্ডপের শীর্ষে ছিল পত্রপুষ্পে তৈরী মিলন-সমুৎসুক ময়ূর-মিথুন। একটি ছিল আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে আর অন্যটি চক্রাকারে প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল তার অপূর্ব কলাপ।

এই গড়ে তোলা বসন্তবিতানেই শুরু হয়েছিল শুজাকে নিয়ে বেগম আর হারেমবাসিনী কাঞ্চনীদের আনন্দ-উৎসব।

ফুল দিয়ে তৈরী সিংহাসনে এসে বসলেন শুজা। বেগমরা বসলেন যুবরাজের দুদিকে সারি দিয়ে। প্রত্যেকের হাতে একটি করে রক্তগোলাপ।

কাঞ্চনীরা কুর্নিশ করতে করতে ওদের এনে বসিয়েছিল উৎসব মঞ্চে।

এরপর শুরু হল নৃত্যগীত আর পান ভোজন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নৃত্যগীত পটিয়সী তরুণীদের সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল এই হারেমে। শুজা শক্তিমান, স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় আর কলাবিদ্যার অনুরাগী। তাই পিতার মত খুশরোজের প্রবর্তন করেছিলেন রাজমহলে।

চব্বিশ বছরের যুবরাজ প্রদীপ্ত-যৌবন মদনের মত বিহার করলেন পুষ্পিত বসন্তের বনভূমিতে। শতপদ্মশোভিত সরোবরে একমাত্র মাতঙ্গ।

বেগমদের হাত ধরে বিহার করছেন, হঠাৎ কলকণ্ঠ কোকিলের

মত গান গেয়ে উঠল কোন কাঞ্চনী। ময়ূরের মত সপ্তপর্ণীর তলায় নৃত্য শুরু করল কঙ্কনদেশ থেকে আগত এক হারেমবাসিনী। কি স্বচ্ছন্দ তার দেহ-ভঙ্গিমা। ভ্রূভঙ্গে, কটাক্ষে যেন রতির নয়ন-বিলাস। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গে দ্রুতলয়ে বোল তুলল এক গুর্জর-কন্যা। মুরলীর ধ্বনি শোনা গেল লতাবেষ্টিত কিংশুক-তরুর আড়াল থেকে। কোন মায়াময়ী বেহেস্তের হুরী বাঁশিতে তুলল কলতান।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন শুজা। ধীরে ধীরে কখন হাতখানা চলে গেল কণ্ঠলগ্ন মুক্তা মালাটির দিকে। নর্তকীর আশ্চর্য নৃত্য পরিকল্পনার জন্য উপহার। কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠ-দেশ থেকে নেমে এল হাতখানা। খুশরোজের পরিপূর্ণ পরিকল্পনাটি যার, এই অমূল্য মুক্তামালাটি যে তারই প্রাপ্য। কোথায় সে! কোথায় সে! এই আনন্দের উৎসমুখটি যে খুলে দিয়েছে, সে এখনও দৃষ্টির আড়ালে কেন! অবিস্মরণীয় কোন রূপ নিয়ে সে শুজার সামনে আবির্ভূত হবে আজ!

যুবরাজ হঠাৎ লীলাভরে পাশে দাঁড়ান এক কাঞ্চনীকে জিজ্ঞেস করলেন, রেশমীকে দেখছি না কেন, সে কোথায়?

কাঞ্চনী বলল, আজ এই খুশীর উৎসবে রেশমী অনুপস্থিত মালেক।

যুবরাজ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কারণ?

কাল শেষ রাতে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে সেই যে সে শয্যা নিয়েছে, আর ওঠেনি।

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন যুবরাজ, সে কি অসুস্থ?

প্রায় একমাসকাল প্রতিদিন সে নৃত্যগীতের তালিম দিয়ে বেড়িয়েছে আমাদের। অক্লান্ত পরিশ্রমে রেশমী অবসন্ন হয়ে শয্যা নিয়েছে যুবরাজ।

নৃত্যগীত আর পানভোজন চলতে লাগল। যুবরাজ শুজা ঘুরতে ঘুরতে এক সময় অন্তর্হিত হলেন।

হারেমের শেষ গৃহটি পাহাড় সংলগ্ন। গৃহসারির পশ্চাদদেশে তার অবস্থান। শাহজাদা একাকী সেই গৃহদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের কপাট আধখানা ভেজান। কক্ষের কোণা থেকে দীপ-শিখার ক্ষীণ আলো দেহলীপ্রান্তে এসে পড়েছিল।

যুবরাজ শুজা আবেগভরা কণ্ঠে ডাকলেন, রেশমী—কোথায় তুমি?

হঠাৎ আধো অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে একটা খসখস আওয়াজ ভেসে এল। পরক্ষণেই যুবরাজ শুজার সামনে নতজানু হয়ে বসল এক অষ্টাদশী কন্যা। সবুজ শারি পাখির গায়ের রঙের একটা বেনারসী ওড়নায় বুকের সোনালী কাঁচুলিটি ঢাকা পড়েছে। পরনে শুকপাখির ঠোঁটের মত লাল চুড়িদার।

রেশমীর নত মুখখানা নিজের দুহাতের অঞ্জলিতে তুলে শুজা বললেন, কি হয়েছে তোমার পিয়ারী? আজ খুশরোজের রাত যে ডুবে গেল অন্ধকারে।

রেশমী চোখ দুটো এতক্ষণ বন্ধ করে রেখেছিল শুজার হাতের অঞ্জলির ভেতর। যুবরাজের কথার উত্তাপে শুক্তির মুখ খুলে গেল। অমনি নিটোল দুটি মুক্তোর বিন্দু ঝরে পড়ল শুজার হাতে।

বিচলিত শুজা শশব্যস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে আঘাত দিয়েছে পিয়ারী?

রেশমী অর্ধস্ফুট স্বরে বলল, আমার মালেক যেখানে শাহজাদা সেখানে নিজের নসীব ছাড়া আর কার সাধ্য আছে আমাকে আঘাত করবার?

এবার ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে তসলিম করে রেশমী বলল, গুস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা। দাসীর কুটিরে এখনও শাহজাদাকে বসার আসন দেওয়া হয়নি।

বলতে বলতেই একখানা কুর্সি টেনে এনে তার ওপর হাত ধরে বসাল শুজাকে।

এবার শুজা বললেন, তুমি যখন নসীবের কথা তুললে তখন বলি পিয়ারী, আমি যদি শাহজাদা না হতাম তাহলে সুখী হতাম।

একথা কেন বলছেন শাহজাদা? আল্লা মেহেরবান আপনাকে শাহনশার উপযুক্ত পুত্র করেই গড়ে তুলেছেন।

স্বাধীনতা নেই রেশমী, বাঁধা পড়ে আছি দাসত্বের শেকলে।

সেরা খাবার খাচ্ছি, সেরা সেবাটি পাচ্ছি, তবু একথা কখনও ভুলতে পারি না যে আমি সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি।

রেশমী বলল, আমার কাছে সবকিছু হেঁয়ালি মনে হচ্ছে মালেক। এতদিন জেনে এসেছি, আমার শাহজাদা দিলদরিয়া, খুশীর পানসীতে ভেসে চলাই তাঁর স্বভাব। এমন এক মুক্ত মানুষকে কে বন্দী করতে পারে?

পারে রেশমী, বাদশার ঘরে জন্মালে কতকগুলো কানুনে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। সব সময় নিজের মর্জি মাফিক কাজ করা যায় না। এই যেমন শাহজাদীদের বাইরে সাদি করা বারণ। এমন সাদিতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান বাদশা। তাছাড়া শাহজাদাদেরও খুশী মত সাদি করার সুযোগ নেই। খানদানি ঘর মিললে তবে সাদি।

রেশমী বলল, বাদশাজাদীদের কথা বলতে পারব না মালেক, তবে শাহজাদাদের সম্বন্ধে কানুনটায় আপত্তির কি থাকতে পারে।

উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হল শুজা। বললেন, একটা মানুষেব ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম থাকবে না?

যেমন?

রেশমীর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললেন শাহজাদা, তোমার মত দুমূল্য রত্নটিকে এতদিন আমি বেগমমহলে নিয়ে যেতে পারলাম না, একি আমার কম আফশোষ পিয়ারী।

জলতরংগের মত হাসি ছড়িয়ে দিল রেশমী। হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বলল, বেগম মহলে ঢোকার সৌভাগ্য নিয়ে যে জন্মায়নি তাকে মিথ্যে বেগম বানাবার সাধ কেন শাহজাদা? একটা সামান্য 'কাঞ্চনী' আপনার অফুরন্ত পেয়ার পেয়েছে, এর চেয়ে তার বেশী পাওয়া আর কিসে হতে পারে। আমি সুখী জনাব। কেবল এইটুকু দোয়া আল্লার কাছে কামনা করি, তিনি যেন চোখের আলোটুকু মুছে নেবার আগে পর্যন্ত আপনাকে দু'চোখ ভরে দেখার সুযোগ দেন।

শুজা স্থির দৃষ্টিতে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন রেশমীর দিকে। শাহজাদার পলক পড়ে না। কাজলপাতির মত বড় টানা টানা দুটি চোখ মেলে রেশমীও দেখতে লাগল তার শাহজাদাকে।

একসময় শুজা বললেন, তোমাকে ছাড়া কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হয় না পিয়ারী।

এ আপনার রেশমীর ওপর অনেক অনুগ্রহ মালেক। কিন্তু আজ রাতের উৎসব তো আমাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকার কথা নয়। আমি তো নিজের হাতে একে একে সব কটি অনুষ্ঠান সাজিয়ে দিয়েছি।

মৃদু হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে শুজা বললেন, থরে থরে সাজান আছে উৎকৃষ্ট সুরার পাত্র, কিন্তু সাকী কোথায়? যার ছোঁয়ায় সুরা হয়ে উঠবে স্বপ্ন।

রেশমী বলল, বেগম সাহেবারা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন। আপনি উৎসব প্রাঙ্গণে যান শাহজাদা, আমি কালবিলম্ব না করেই লতা-বিতানে মিলিত হচ্ছি।

শুজা বললেন, অন্তত অনুষ্ঠান সমাপ্তির নৃত্যটি তোমার নূপুরেই বেজে উঠুক, এই ইচ্ছা।

মৃদু হাসির সঙ্গে কুর্নিশ করে রেশমী বলল, মালেকের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

শেষ নাচটা নেচেছিল রেশমী। জলের ঘূর্ণির মত ঘুরছিল তার লাল বেনারসীর ঘাগরা। আকাশে উড়ছিল আগুনের দীপ্ত শিখার মত সোনালী উত্তরীয়। সে যেন নিজের মধ্যে ছিল না। বাসন্তী ভুবন মনমোহিনী হয়ে গিয়েছিল। প্রান্তরের প্রতিটি বৃক্ষ, প্রতিটি লতাকুঞ্জ ঘুরে ঘুরে সে নাচছিল। মন্ত্রমুগ্ধ কাঞ্চনীরা, মোহাচ্ছন্ন বেগমসাহেবারা।

শেষে সে এসে দাঁড়িয়েছিল মণ্ডলীর মাঝখানে। সে যেন লীলাময়ী প্রকৃতি। তাকে ঘিরে নৃত্যলীলায় মত্ত ষড়ঋতুর কন্যারা।

নাচ শেষে তারা শাহজাদাকে কুর্নিশ করে বসে পড়ল নৃত্যের আসরে।

যোধপুরী বেগম বসেছিলেন শাহজাদা শুজার পাশটিতে। তাঁর ইংগিতে বেগমমহলের দাসীরা সুবর্ণখচিত রৌপ্যপাত্রে বয়ে আনল নানা রকমের মূল্যবান উপহার।

বেগম এক একজন কাঞ্চনীকে আহ্বান করে উপহার বিলিয়ে

দিতে লাগলেন। শেষে সমস্ত পরিকল্পনার রূপকার রেশমীর পালা এল। শাহজাদা ইংগিতে বেগমসাহেবাকে কিছু বললেন।

কাছে এসে দাঁড়াল রেশমী সসম্ভ্রমে কুর্নিশ জানিয়ে।

বেগম সাহেবা প্রথমে তার মাথায় পরিয়ে দিলেন মণিখচিত একটি সুবর্ণ মুকুট। পরক্ষণেই শাহজাদা নিজের কণ্ঠলগ্ন মুক্তামালাটি খুলে রেশমীর হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবা এগিয়ে এসে রেশমীর হাতে ধরা মালাটি তুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন তার গলায়।

উৎসবের শেষ হল রোশনাইতে। আকাশের আঙিনায় ফুটল আর ঝরল সংখ্যাহীন আলোর-কুসুম. বছরের শেষ ঋতু-উৎসব সমাপ্ত হল নারীকণ্ঠের আনন্দ-ধ্বনির ভেতর দিয়ে।

মাঝরাত অবধি বাতাস ছিল না। এখন প্রাসাদের বেগম মহলে জাফরি-কাটা অলিন্দের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়া। শাহাজাদা শুজার বুক ছুঁয়ে আছে যোধপুরী বেগম সাহেবার চাঁপা ফুলের পাপড়ির মত পাঁচটি আঙুল। দুজনেই ঘুমে অচেতন। আজ খুশরোজের দিনে বেগম যুবরাজকে দিয়েছেন একটি খুশীর খবর। সে আসছে। বসরাই গোলাপের একটি কুঁড়ি ফুটে উঠছে তাঁর দেহের মধ্যে।

বাতাসের গোঙানিটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে মিশে গেল একটা ক্ষীণ আর্তনাদ। বেগম সাহেবার গাঢ় ঘুমটা ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে এল। কে যেন মৌমাছির একটা চাকের তলায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আর তাদের আর্ত চিৎকার ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

ঘুম ভেঙে গেল বেগম সাহেবার। তিনি উঠে গেলেন শয্যা সংলগ্ন অলিন্দের কাছে। জাফরিকাটা গবাক্ষের ভেতর দিয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুকে চোখ পাতলেন।

গাঢ় লাল বেনারসী-চেলির টুকরো কে যেন উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে সোনালী পাড়।

আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। বিপরীত বাতাসে সে শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। কান পেতে রইলেন যোধপুরী বেগম। মনে

হল শব্দটা গঙ্গার কিনারায় হারেমের ভেতর থেকে উঠে আসছে।

একটা হল্লা শোনা গেল। কারা যেন যুবরাজ শুজার মহলের দিকে ছুটে আসছে। হারেমের ওপরের আকাশ সিঁদুরে লাল। স্তব্ধ হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা অশ্বত্থ গাছ।

আগুন! আগুন!

হারেমের পাহারাদারগুলো যেন ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল শুজার প্রাসাদের সিং দরজায়। মুহূর্তে নড়ে উঠল প্রাসাদটা। সদ্য জেগে ওঠা প্রাসাদ রক্ষীরা অসংবৃত পোষাক পরিচ্ছদেই ছুটে গেল হারেম লক্ষ্য করে।

দমকা হাওয়ায় ঝলসে উঠছে আগুন। একটা লাল ঘোড়া যেন কেশর ফুলিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে হারেমেব এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। গঙ্গা থেকে পাত্র ভরে জল তুলে এনে তাকে শান্ত করার আগেই সে উড়ে চলে গেল দিগন্তে। পেছনে পড়ে রইল কালো কালো ছাইয়ের স্তূপ আর দগদগে ক্ষতের মত ছড়ানো ছিটানো কিছু অঙ্গার।

ষোলশো চল্লিশ খ্রীস্টাব্দের প্রথম পর্বে এক উৎসবের রাতে বাংলার সুবাদার শাহজাদা শুজা প্রত্যক্ষ করলেন ভাগ্যদেবীর এক নিষ্ঠুর লীলা।

পঁচাত্তর জন পরমা রূপসী ও কলাবতী হারেমবাসিনী সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গেল ভয়ংকর সেই অগ্নিকাণ্ডে। মূক শুজার ওষ্ঠ দিয়ে অস্ফুটে উচ্চারিত হল একটি নাম, রেশমী!

বুক ঠেলে উঠে এল এক দীর্ঘশ্বাস। নিঃশব্দে তা ভেসে চলে গেল চৈত্র শেষের হাওয়ায়।

যথা বিহিত আদেশ দিয়ে ফিরে এলেন শুজা আপন প্রাসাদে। ঢুকলেন বেগম যোধপুরীর কক্ষে। নীরব, নতমুখ। বুকের মধ্যে কালো একখণ্ড পাথরের ভার।

যোধপুরী বেগম শাহজাদার পায়ের সাড়া পেয়ে গবাক্ষ থেকে চোখ ফেরালেন। অশ্রুসজল বড় বড় দুটো চোখ মেলে চেয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে।

কথা বললেন শুজা, বেগম, আমার উৎসবের বাতি চিরদিনের মত নিভে গেল।

কথাগুলো একটা হাহাকারের মত শোনাল।

বেগম যোধপুরীর বুকে জুড়ে চলছিল অস্বাভাবিক আলোড়ন তবু তিনি নিজেকে সংযত করে বললেন, একথা বলবেন না শাহজাদা, আপনার খুশীর রোশনাই চিরদিন রাতের আশমানকে আলোয় ভরে তুলবে।

শুজা এগিয়ে এসে বেগমের হাত ধরলেন। বেগম বুঝলেন, এই মুহূর্তে একটা অবলম্বন চাইছেন তাঁর স্বামী। যোধপুরী শাহজাদাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন শয্যার ওপর। বুকের মাঝে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, দুর্ভাগ্যের মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলে কিন্তু সে মেঘ চিরদিনের নয়। আপনি শান্ত হোন।

একটু থেমে আবার বললেন, আজ আপনি বড় ক্লান্ত। যতক্ষণ খুশী বিশ্রাম নিন অন্দরমহলে। আমি পাশের কক্ষটিতে আপনার আদেশের অপেক্ষায় থাকব।

শুজা বেগমকে বলে পূর্ণ একপাত্র সুরা পান করলেন। তারপর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেন শয্যায়। বেগম স্বামীকে একান্ত বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন পাশের কক্ষে।

শয্যায় শুয়ে ঘুম এল না শুজার চোখে। শরাবের ঘোর দেহ ছাড়িয়ে যুবরাজের মনকে স্পর্শ করল। আশ্চর্য মায়াময় কতকগুলো দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগল চোখের ওপর।

আগ্রার রঙমহলে বসেছে খুশরোজের মেলা। লক্ষ্ণৌয়ের মীনাবাজারের মত অজস্র পণ্যসামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছে থরে থরে। ওমরাহদের পত্নী আর কন্যারা রঙমহলের এক একটি স্থান নির্বাচন করে দামী পর্দায় তাকে ঘিরে ফেলেছেন। মাথার ওপরে সুদৃশ্য চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার চারদিক ঘিরে রেশমী কাপড়ের ঝালর। ঝালরের গায়ে সোনালী বেনারসী জরীর কাজ।

ওমরাহ পত্নীরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন সারা দেশ ঢুঁড়ে তুলে আনা দুর্মূল্য সব জিনিস। ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী সম্ভার নিয়ে সাজিয়েছেন নিজ নিজ দোকান।

ওমরাহ ও মনসবদারের কিশোরী অথবা তরুণী কন্যারা প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে মায়েদের পিছে পিছে। ওমরাহ পত্নীরা

এই মেলা উপলক্ষে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন তাঁদের ভাবী পুত্রবধূকে।

বেগমরা এলেন মেলা দেখতে। ওমরাহ পত্নীদের সঙ্গে হৃদ্য আলাপে জড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেকেই নিজেকে নানাভাবে চাইছেন মেলে ধরতে। কোন একটি সুন্দরী কিশোরী মায়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই কয়েক জোড়া চোখ কালো ভ্রমরের মত উড়ে এসে বসল আধফোটা পদ্মের মত নিটোল মুখখানার ওপর।

কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?

মেয়েটি জড়তাহীন গলায় জানাল, মঞ্জরী।

অন্যজন প্রশ্ন করলেন, কি অর্থ তোমার ঐ নামের?

মেয়েটি বলল, মুকুল।

কেউ একজন বললেন, তোমার পছন্দের ফুলটি কি?

একটুখানি ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে উঠল মুখে। হঠাৎ সোনালী আলোর ছোঁয়া লাগল, অমনি বলে উঠল, পদ্ম।

এক বেগম এগিয়ে এসে বললেন, গোলাপ ভালবাস না?

মাথাটি ঈষৎ কাৎ করে মেয়েটি তার ভালবাসার কথা জানাল।

অন্য এক বেগম বলে উঠলেন, কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ?

মেয়েটি এবার কিন্তু অসংকোচে উচ্চারণ করল, রাণা প্রতাপ সিংহের মত পুরুষ।

স্তব্ধতার একটা পর্দা যেন নেমে এল উৎসব মণ্ডে।

এক মনসবদারের পত্নী বেগম সাহেবাদের খুশী করার জন্যে বললেন, বাদশা আকবর, সম্রাট শাজাহান তোমার পছন্দের পুরুষ নন?

কিশোরী এর কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে মায়ের অঞ্চলের আড়ালে মুখ লুকালো।

কন্যার কথায় ওমরাহ পত্নী কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্যে বলে উঠলেন, নির্বোধ মেয়ে, সম্রাট চিরদিনই পুরুষের ভেতর শ্রেষ্ঠ, তাঁর সঙ্গে কি অন্য কারু তুলনা চলে। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

কিশোরীটির মুখ দেখে মনে হল না যে সে মায়ের কথা

মেনে নিয়েছে। তবে মুখে কোন প্রতিবাদ করল না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এই কিশোরীর ছবি নিজের চোখে দেখেননি শাহজাদা শুজা। বেগম আনোয়ারার মুখ থেকে ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন, আজ মনশ্চক্ষে তাই দেখতে লাগলেন।

এবার স্বচক্ষে দেখা একখানি ছবি ফুটে উঠল তাঁর চোখের ওপর।

সেই খুশরোজের উৎসব। সমাপ্তির দিনে সম্রাট শাজাহান আসবেন মেলা-প্রাঙ্গণে। নারীদের আনন্দ-উৎসবে একমাত্র পুরুষ-অতিথি তিনি। সাজানো বিপণিতে শুরু হবে ক্রয়-বিক্রয়। ক্রেতা, স্বয়ং সম্রাট আর বিক্রেতা, ওমরাহ মনসবদারের ঘরের সুন্দরী কেতাদুরস্ত ললনারা। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ভেতর যে কোন জিনিসের মূল্য নিয়ে চলবে কপট দরকষাকষি। উচ্চ কণ্ঠে সম্রাটের সঙ্গে বিক্রেতা রমণীরা করবে বাক্য বিনিময়। বাদশা যে একজন অনভিজ্ঞ, আনাড়ি ক্রেতা এ বার্তা সরবে ঘোষণা করবে রমণীকুল। এই কপট ঘোষণা, অসহায় মুখ করে উপভোগ করবেন সম্রাট। শেষে ন্যায্য মূল্যের অতিরিক্ত দাম দিয়ে ক্রয় করবেন তাঁর পছন্দসই জিনিসগুলি।

সর্বশেষ অনুষ্ঠানে সম্রাট মধ্যমণি হয়ে বসবেন মেলা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে রক্ষিত সিংহাসনে। উৎসব মঞ্চের বিভিন্ন দ্বার দিয়ে ওড়না উড়িয়ে, ঘাগরায় ঘূর্ণি তুলে ছুটে আসবে কাঞ্চনীরা। সারা দেশ ঢুঁড়ে বাদশা মহলে নিয়ে আসা হয়েছে এই সদ্য ফুটে ওঠা কাঞ্চনীদের। যেন সোনার জলের ঝর্ণায় স্নান করে এসেছে ওরা। বাদশার আনন্দদায়িনী, তাই ওরা সোনালী স্বপ্নবিহারিণী 'কাঞ্চনী'

খবর এল, উৎসবের সমাপ্তি-দিবসে বাদশা থাকবেন অনুপস্থিত। হঠাৎ অসুস্থতাই বাদশার অনুপস্থিতির একমাত্র কারণ।

খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে খুশরোজের মেলায় নেমে এল বিষণ্ণতার ছায়া। নারীমণ্ডলীতে একমাত্র পুরুষ, সম্রাট। তাঁর বিনোদনের জন্যই এই মেলার অনুষ্ঠান। তিনি না এলে সব

আয়োজনই পণ্ড! শেষে উদ্যোক্তাদের সমবেত পরামর্শে স্থির হল, বাদশার পরিবর্তে আসবেন কোন এক শাহজাদা। সম্রাটের অতি প্রিয় কন্যা জাহানারা বেগমকেই দেওয়া হল, এই সমস্যা সমাধানের ভার।

বাদশার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো তখন কার্যোপলক্ষে রাজধানী দিল্লীতে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্য সুবার ভারপ্রাপ্ত ঔরঙ্গজেব তাঁর সুবা সংগঠনে ব্যস্ত। তাছাড়া এসকল নারীঘটিত লীলা-বিলাস কোনদিনই তাঁর পছন্দের বস্তু নয়। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বক্স তখন সুদূর গুজরাট প্রদেশে তাঁর সুবাদারী শাসন কায়েম করে বসেছেন। তিনিও আগ্রা থেকে বহুদূরে।

সম্রাটের মধ্যম কুমার শাহজাদা শুজা এসেছিলেন তাঁর রাজধানী রাজমহল থেকে। পিতার কাছে সদ্যপ্রাপ্ত বাংলা সুবাটির সুরক্ষার জন্য একজন সুদক্ষ সেনাপতি চাইতে এসেছিলেন তিনি। যে ইসলাম খাঁ আরাকানের নৌবহরকে কামানের মুখে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন, তিনি এখন বাংলা ছেড়ে আগ্রায়। তাঁকেই নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য আর্জি জানাতে এসেছিলেন শুজা।

এখন একমাত্র এই পুরুষটিই ভরসা, যাঁর দেহে বাদশার রক্ত প্রবাহিত।

জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সম্রাট শাজাহান যেমন সব থেকে বেশী ভাল-বাসতেন, তেমনি অনেক সময় রাজকার্যে তার পরামর্শও গ্রহণ করতেন।

শুজার আর্জি সম্বন্ধেও কন্যা জাহানারার মতামত জানতে চেয়েছিলেন সম্রাট।

এই সুযোগে শুজাকে কাছে ডেকে পাঠালেন জাহানারা।

একমাত্র দারা শিকোই ভায়েদের মধ্যে প্রিয় ছিল জাহানারা বেগমের। তাই অন্য ভায়েরা এই ভগ্নীটির সংশ্রব এড়িয়ে চলতে চাইত।

এখন ভগ্নীর ডাক পেয়ে শাহজাদা শুজা গিয়ে দাঁড়ালেন জাহানারা বেগমের কাছে।

তলব কেন বোন?

সেনাপতি ইসলাম খাঁকে আগ্রা থেকে কোথাও সরিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে পিতার নেই।

কথা শুনে ম্লান একটা ছায়া ঘনাল শুজার মুখে। কিছুসময় অধোবদনে চিন্তা করে শুজা একসময় মুখ তুলে বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কি আমাকে কিছু সাহায্য করতে পার?

চেষ্টা করব তবে তার আগে তোমাকেও আমার সামান্য একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে।

বল, আমার সামর্থ্যের ভেতর হলে অবশ্যই তোমার কথা রাখব।

পিতা হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন, তাই খুশরোজের শেষ দিনটিতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারছেন না। তুমি কি সেদিন পিতার প্রতিনিধি হিসেবে উৎসবে যোগ দিতে পারবে?

কথাটা শুনে মনে মনে বড় গর্ব অনুভব করলেন শুজা। মুখে বললেন, আমার ভগ্নীর ইচ্ছাকে সম্মান জানানো অবশ্য কর্তব্য বলেই মনে করি আমি।

যথা লগ্নে শুজা হাজির হলেন খুশরোজের মেলায়। সোনার মোহর ছড়িয়ে কিনলেন প্রচুর দৃষ্টিনন্দন সামগ্রী। শেষে যোগ দিলেন কাঞ্চনীদের নৃত্যগীতের আসরে।

নারী কণ্ঠের সুর-মূর্ছনায় মুগ্ধ শাহজাদা। নারীদের হাতের ছোঁয়ায় বেজে উঠল সুরযন্ত্রগুলি একতানে।

শুরু হল নৃত্য। মনে হল এরা রক্তমাংসের দেহধারী কাঞ্চনী নয়। অপার্থিব লোক থেকে নেমে এসেছে হুরীর দল।

সেই নাচের আসরেই শুজা দেখলেন একটি মেয়েকে। সবার চেয়ে স্বতন্ত্র। শতদলের মাঝে যেন একটি সহস্রদল পদ্ম। নমনীয় অথচ ঋজু দেহ-ভঙ্গিমা। গাত্রবর্ণ চাঁপা ফুলকেও হার মানায়। হাসিতে, অপাঙ্গ দৃষ্টিতে, লম্বিত বিনুনীর চঞ্চল নৃত্যে মনে হল, সে যেন শাহজাদাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কাছে এগিয়ে আসছে, পরমুহূর্তেই লীলা রসভরে সরে যাচ্ছে দূরে। সমুদ্রের ঊর্মিমালা ফেনার ফুল ফুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে সাগরবেলায়, পরক্ষণেই সোনালী বালুকার বুকে স্বপ্ন এঁকে সরে যাচ্ছে চঞ্চল পায়ে।

নৃত্যের শেষে শুজা নিজের গলার মুক্তা মালাটি খুলে পরিয়ে দিলেন অপরিচিতা, অসামান্যা প্রতিভাময়ী সেই কাঞ্চনীর গলায়।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?

অতি সম্ভ্রমে মাথা নিচু করে কাঞ্চনী উত্তর করল, রেশমী জাঁহাপনা।

শাহাজাদা শুজা বললেন, রেশমের মতই কোমল, নামী আর উজ্জ্বল তুমি। কার হাত ধরে এসেছ এ মহলে?

চাচা ইসলাম খাঁ হারেমে আমার ঠাঁই করে দিয়েছেন জনাব।

সেনাপতি ইসলাম খাঁ!

শুজা বিস্ময়সূচক এক শব্দ করলেন।

রেশমী শাহজাদার বিস্ময়ের কারণটুকু অনুধাবন করতে পারল না।

কয়েকদিনের ভেতরেই শুজা দেখা করলেন বেগমসাহেবা বা প্রধান শাহজাদী জাহানারার সঙ্গে।

সাক্ষাৎ মাত্রই জাহানারা বলে উঠলেন, বাদশা মঞ্জুর করেছেন তোমার আর্জি।

শুজা মূল্যবান কিছু রত্নসম্ভার ও মসলিন বস্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময়। এই উপঢৌকন একেবারে উদ্দেশ্যহীন ছিল না।

তিনি শ্বেত প্রস্তর নির্মিত এক হস্তির অবয়ব বিশিষ্ট পাত্রে তাঁর উপহার সম্ভার ভরে ভগ্নীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আমি জানি, বাদশা মহলে তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। ইসলাম খাঁকে আমার সঙ্গে যাবার অনুমতি দিয়ে তুমি আমার ধারণাকেই আর একবার দৃঢ় করলে।

জাহানারা উপহার সামগ্রী সুদৃশ্য আধার থেকে বের করে দেখতে লাগলেন। মান্নারের সাগর থেকে সংগ্রহ করা শ্রেষ্ঠ কয়েকটি মুক্তো বেগমসাহেবার মনোহরণ করল।

এর পর বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি মসলিন বেরিয়ে এল পাথরের কৌটো থেকে। কচ্ছপের ডিমের আকারে রাখা ঝুনা মসলিনের শাড়িখানা খুলে ফেলে হাওয়ায় ওড়াতে লাগলেন জাহানারা। দারুণ খুশীতে দোপাট্টার মত নিজের অঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। শাহাজাদীর বসরাই গোলাপী রঙের চীনা রেশমের অঙ্গবাস তার যথার্থ রঙটি নিয়ে ফুটে উঠল মসলিনের সূক্ষ্ম বুননের স্বচ্ছতা ভেদ করে।

পরমা সুন্দরী জাহানারা আরও অপরূপা হয়ে উঠলেন।

এবার একমুখ হাসি ছড়িয়ে ভায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন জাহানারা, আমারও তো তোমাদের কিছু দিতে ইচ্ছে করে শুজা, বল, কি পেলে খুশী হও?

শাহজাদা শুজা অমনি বলল, এই মুহূর্তে বড় কিছু চাই না তোমার কাছে, একটি ছোট্ট আর্জি আছে, মঞ্জুর করলে খুশী হব।

বল, আমার হাতের ভেতর থাকলে অবশ্যই পাবে।

তোমার হারেমের এক কাঞ্চনীকে চাই, আমার রাজমহলের হারেমটি গড়ে তুলবে সে।

একটু ভেবে নিয়ে জাহানারা কৌতুকের সুরে বললেন, কোন বিশেষ কাঞ্চনীর ওপর তোমার পক্ষপাত আছে নাকি?

শুজা একটুখানি ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত নামটা উচ্চারণই করে ফেললেন, সম্ভবত মেয়েটির নাম রেশমী।

শ্বেতপাথরের তৈরী প্রকোষ্ঠে খিলখিল হাসি ছড়িয়ে বললেন জাহানারা, তোমার পছন্দের তারিফ না করে পারছি না শুজা। দিল আর দৃষ্টি দুটোই আছে তোমার। কথা যখন দিয়েছি তখন তা রাখার চেষ্টাও আমি করব।

একটু থেমে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, এই বিশেষ পছন্দের কাঞ্চনীটির ভার বইতে পারবে তো?

অবাক হয়ে ভগ্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুজা বললেন, এর অর্থ?

জাহানারা বললেন, সম্রাট জাহাঙ্গীর আর সেই বিদেশী ভ্রাম্যমাণের গল্পটা জান না?

কি রকম? একটু শোনাও।

বিদেশী মানুষটির দেশ বিদেশের গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতা। বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁর মুখের গল্প শুনে ভারী খুশী। মানুষটি বড় আমুদে। প্রাসাদের সব অনুষ্ঠানেই তাঁর ডাক পড়ে।

একদিন বাদশার সঙ্গে বসে কাঞ্চনীদের নাচ দেখে মানুষটি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাদের ভেতর একটি নর্তকী বিশেষভাবে দাগ কাটল তাঁর মনে।

সম্রাট যখন সিংহাসনে গিয়ে বসেন তখন তাঁকে তসলিম জানাতে

যায় কাঞ্চনীরা। এই সুযোগে কয়েকবার মেয়েটির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখিও হল।

একসময় কেমন করে যে পরস্পরে মিলিত হল তা কেউ জানে না। কিন্তু মেয়েটির মা ঘটনা জানতে পেরে দুজনকে একেবারে আলাদা করে দিল।

একদিন ওমরাহ, মনসবদাররা সভা জাঁকিয়ে বসে আছেন। বিদেশী মানুষটিও সম্রাটের ডাকে এসে বসেছেন সভার সামনের সারিতে। কাঞ্চনীরা রোজকার মত বাদশাকে তসলিম করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাদশা বললেন, আল্লার কৃপায় এই বিচক্ষণ বিদেশী বহুদর্শী মানুষটিকে আমাদের মধ্যে পাওয়া গেছে। আপনারা এঁর গুণ-পনায় নিশ্চয়ই সকলে মুগ্ধ হয়েছেন—।

জাঁহাপনা যথার্থই বলেছেন, সকলে তখন সমস্বরে বিদেশী মানুষটির গুণগান করতে লেগে গেলেন।

বাদশা এবার বিদেশী মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা সকলেই আপনার জ্ঞান ও কথা বলার অপূর্ব ক্ষমতায় মুগ্ধ। আপনার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটি মূল্যবান জিনিস আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারেন। পুরস্কারটি পেলে আপনি যেমন খুশী হবেন আমরাও তেমনি তৃপ্ত হব।

সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কি চেয়ে বসলেন জান?

শুজা অমনি বলে উঠলেন, তাঁর পেয়ারের ঐ কাঞ্চনীটিকে।

সাবাস শুজা, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছিনা। তবে শেষ পরিণতিটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

কি রকম?

বিদেশী সবিনয়ে বললেন, সম্রাট যখন আমার ওপরেই পুরস্কারটি নির্বাচনের ভার দিয়েছেন তখন আমি আমার মনের মত পুরস্কারের কথাই বলব।

সম্রাট দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, অবশ্যই।

বিদেশী মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন কাঞ্চনীর দিকে। ওঁর প্রিয় নর্তকীটিকে দেখিয়ে বললেন, একেই আমি আমার সবসেরা পুরস্কার বলে মনে করি সম্রাট।

বিদেশী মানুষটির নির্বাচনের বহর দেখে সমস্ত সভা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল। সম্রাটও স্তব্ধ। কাঞ্চনীটি সম্রাটের অতি প্রিয় নর্তকী। কিন্তু সম্রাটের কাছে কথার দাম অনেক বেশী। হঠাৎ বাদশা অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। হাসি থামলে বললেন, এই কাঞ্চনীটির ভার বইতে পারবেন আপনি ?

বিদেশী সানন্দে ঘোষণা করলেন, অবশ্যই।

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট তাঁর দেহরক্ষীদের আদেশ দিলেন, ঐ কাঞ্চনীকে শূন্যে তুলে চাপিয়ে দাও বিদেশী সাহেবের কাঁধে, দেখি সাহেব ভার বইতে পারেন কিনা।

কাঞ্চনীকে চাপান হল কাঁধে। সাহেব কিন্তু হারবার পাত্র নন। তিনি কাঞ্চনীকে কাঁধে নিয়ে হাসতে হাসতে সভা থেকে বেরিয়ে নিজের আস্তানার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

শুজা বললেন, তুমি আমাকেও তাই করতে বলছ নাকি ?

হেসে বললেন জাহানারা, ক্ষতি কি ?

শুজা বললেন, সম্রাটনন্দিনী যদি প্রকাশ্যে এ দৃশ্য দেখতে রাজি থাকে তাহলে তার সহোদর অবশ্যই সে ভার বহন করবে।

রেশমী আর ইসলাম খাঁকে সে যাত্রায় শাহজাদা শুজা সঙ্গে করে আনতে পেরেছিলেন রাজমহলে।

॥ দুই ॥

দেহে আগুনের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল রেশমীর। সে বিছানা থেকে মেঝেতে নেমেই বিহ্বল হয়ে গেল। বাঁদিকের কামিজ বরাবর আগুন ধরে গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সামনের দরজা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বিচার শক্তি একেবারে লোপ পেয়ে গেল না। রেশমী ছুটে গেল গঙ্গার দিকে খোলা জানালাটার ধারে। মূল গঙ্গা থেকে একটা ছোট খাল বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়েছিল হারেমের লাগোয়া পাঁচিলের গা বরাবর। রেশমী প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টায় কাঠের গরাদ ভেঙে ফেলল প্রথম ধাক্কায়। তারপর জ্বলন্ত দেহখানাকে ছুঁড়ে দিল গঙ্গার জলে।

রাতে নাচের শেষে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে দেহের

দামী অলঙ্কারগুলি খোলার মত উৎসাহ ছিল না তার। তেমনি সজ্জিত অবস্থাতেই শয্যা নিয়েছিল সে। এখন সব কিছু নিয়েই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গঙ্গায়।

জলের ছোঁয়ায় নিভে গেল আগুন, কিন্তু জ্ঞান হারাল রেশমী।

তলিয়ে যাচ্ছিল সে জলের তলায় হঠাৎ একটা মাঝি খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে নিল তার নৌকোয়।

রাতে মাছ ধরার আশায় লোকটা ঢুকে পড়েছিল খালের ভেতর। তারপর নোঙর করে ভোর রাতের জোয়ারের অপেক্ষায় বসেছিল।

মেয়েটিকে নৌকোয় তুলে নিয়ে সে দেখল, একরাশ গহনায় মোড়া তার দেহটা। এই দেখে লোভ সামলাতে পারলনা লোকটা। একসময় সে ফিরিঙ্গি ডাকাতদের নৌকোয় দাঁড়ির কাজ করত। লুঠপাটের পর মালের বখরা পেত না সে। খোরাকী বাবদ কিছু অর্থ গুঁজে দেওয়া হত তার হাতে। সেটাই সে তার গাঁয়ে গিয়ে বউয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসত।

এদিকে কাজে একটু ঢিলে পড়লেই চড় চাপড় খেতে হত মাঝি মাল্লার হাতে। পেটে খেলে পিঠে সয়, কিন্তু খালি পেটে শুধু কিল খেতে মন চাইল না তার। সে একসময় দলের একটা ছোট্ট নৌকো চুরি করে নিয়ে বহু পথ পাড়ি জমিয়ে চলে এল রাজমহলে। এখানেই নদীতে মাছ ধরে রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে নিয়েছে সে। কিন্তু একবার যে লুঠপাটের স্বাদ পেয়েছে তার হাত থেকে সহজে মুছে যাবার নয় লুঠের গন্ধ।

সালংকারা মেয়েটিকে নৌকোয় তুলে নিয়েই সে নদীতে ভেসে চলল।

ওপারে যখন নৌকো ভিড়ল তখন শুকতারা জ্বল জ্বল করছে আকাশে। সোনার সব কটি গয়না খুলে নিল লোকটা রেশমীর গা থেকে। কেবল শুজার দেওয়া মুক্তার মালাটি রয়ে গেল গলায়। সম্ভবত সোনার মত জৌলুস ছিল না বলেই উপহারের মালাটা লুঠেরার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

মালদহের সীমানা ছুঁয়ে নদীর একটা পিচ্ছল পাড়ে অচেতন রেশমীর অগ্নিদগ্ধ দেহটাকে টেনে ফেলে দিয়ে লোকটা নৌকো বেয়ে পালালো।

তবু সামান্য একটু ধর্মবোধ হয়ত কাজ করছিল মানুষটার ভেতরে। না হলে গহনাগুলো খুলে নিয়ে অচেতন দেহটাকে সে নদীর জলেই ভাসিয়ে দিতে পারত।

আকাশে ম্লান হয়ে এল শুকতারার আলো। ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল ভোরের ছবি। হাওয়া বয়ে এল ঝলকে ঝলকে। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যেতে লাগল নদীর ওপর দিয়ে।

ভোরের আজানোর একটা সুর ছড়িয়ে পড়ছিল চরাচরের বুকে। সেই পবিত্র ধ্বনি মঙ্গলময়ের অভয় বাণীর মত অর্ধচেতন রেশমীর কানে এসে বাজতে লাগল। ওঠ, জাগো, তাঁকে স্মরণ কর, তিনি তোমার ভেতর অফুরন্ত শক্তি এনে দেবেন।

ধীরে ধীরে রেশমী উঠে বসল। গত রাতের উৎসব, অগ্নিকাণ্ড, এমনকি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ার কথাও তার মনে পড়তে লাগল। কিন্তু আর কিছু স্মৃতিতে ভেসে উঠল না তার। অবশ্য সেটা সম্ভবও ছিল না।

এখন সে কোথায়! এ তো রাজমহলের প্রাসাদ সংলগ্ন কোন স্থান নয়! তবে সে কোথায় এসে পড়ল, এবং কেমন করেই বা এল এখানে!

নিজের সন্ধানের কোন উত্তরই সে নিজের কাছ থেকে খুঁজে পেল না।

বাস্তবের মুখোমুখি হতেই বিস্ময়ের ঘোরটা ধীরে ধীরে কেটে গেল। সে অনুভব করল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো বাঁ দিকটা তার জ্বলছে। সে নিজের দিকে এতক্ষণে পুরোপুরি তাকাল। যন্ত্রণা ভুলে লজ্জায় মরে গেল সে।

রাতে আগুনে পুড়ে বাঁদিকের পোষাক প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সেই ছিন্ন পোষাকের ফাঁক দিয়ে ফুটে উঠছে দগদগে কতক-গুলো ঘায়ের আভা।

রেশমী তার ডান দিকের ঝুলে পড়া পোষাকের টুকরোগুলো সরিয়ে সরিয়ে বাঁ দিকটা চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

একদিকে যন্ত্রণা, অন্যদিকে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা, এই দুয়ে মিলে কেমন একটা গোঙানীর আওয়াজ সৃষ্টি করল, এবং তা উঠে আসতে লাগল তার ভেতর থেকে।

হঠাৎ রেশমীর চোখ পড়ল একটি মানুষের ওপর। খানিক দূরে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মানুষটি প্রবীণ এবং সম্ভ্রান্ত। সাদা টুপি আর সাদা-ঝোলা পিরানে তাঁকে সাধু প্রকৃতির মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল। তিনি একদৃষ্টে চেয়েছিলেন রেশমীর দিকে।

চোখাচোখি হতেই মানুষটি সরে গেলেন। পাশেই গাছ-গাছালির জটলার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। রেশমী সেদিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ঐ জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। সে সোজা এগিয়ে এলো রেশমীর কাছে। একখানা বোরখা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আপাতত শরীরটা ঢেকে নাও এটা দিয়ে।

রেশমী নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াতে পারছিল না, মেয়েটি বড় যত্নে অতি সাবধানে তার হাত ধরে তুলল। নিজেই বোরখাটা পরিয়ে দিল তাকে। তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে প্রায় পুরো ভারটা নিজের ওপর নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

বড় বড় গাছের জটলার আড়ালে রেশমী দেখল ছোট আকারের অতি সুন্দর একটি মসজিদ। তার একটু দূরে পীর সাহেবের দরগা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গাটি। কাঠচাঁপার একটি গাছ অজস্র ফুল ফুটিয়েছে।

মেয়েটি মসজিদের পাশ দিয়ে রেশমীকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সামনের একটি আস্তানায়। প্রথম দেখা সেই সম্ভ্রান্ত মানুষটিকে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রেশমী।

তিনি একটি কুঠুরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, আমিনা ঐ ঘরেই ওর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। আগে গোশল সেরে নাস্তা করুক, পরে আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।

রেশমীকে গোশলখানায় ঢুকিয়ে আমিনা ফিরে এল উঠোনে।

বাপজান, আগুনে আধখানা ঝলসে গেছে মেয়েটি।

এখানে নদীর তীরে এলো কি করে?

কিছু বলতে পারছে না। তবে বাড়ী পুড়ে যাবার সময় নাকি ওর গায়ে আগুন লাগে। ও জ্বলতে জ্বলতে রাজমহল প্রাসাদের

ধারে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়, তারপর আর কিছু জানে না। জ্ঞান হল এপার গঙ্গার কূলে।

মানুষটি চিন্তিত হলেন, আশ্চর্য! জ্ঞান হারিয়ে গঙ্গায় ভেসে ভেসে তো এতদূর আসা যায় না। তবে কি করে এলো মেয়েটি!

একটু থেমে তিনি বললেন, সে যাই হোক, এখন মেয়েটির সেবা আর চিকিৎসার দরকার। আমি গাঁয়ে গিয়ে কবরেজ মশায়কে ডেকে আনছি। পোড়া ঘায়ের চিকিৎসায় ওঁর জুড়ি আর কেউ নেই।

কবরেজ মশায় এলেন, খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর পোড়া জায়গায় তাঁর তৈরী একটা তেল লাগাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে ফিরে গেলেন। যাবার সময় মোল্লা মেহেরুল্লাহকে বলে গেলেন, ঘা যদি আর সামান্য বেশী গভীর হত তাহলে ওকে বাঁচানো শিবেরও অসাধ্য ছিল। এখন আশা করছি আমার এই তেলেই ও আরোগ্য লাভ করবে। আর একটা কথা আগাম জানিয়ে রাখা ভাল, পুরোপুরি সেরে উঠলেও মেয়েটির ক্ষতস্থানের চামড়া তার স্বাভাবিক অবস্থা আর ফিরে পাবে না। ওটা জায়গায় জায়গায় কুঁচকে থাকবে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে মুখ আর গলার বাঁ দিকটায়। ভাল হলেও মুখের চেহারাখানা বদলে যাবে।

কথাগুলো শুনে মোল্লা সাহেব যেমন আশ্বস্ত হলেন তেমনি দুঃখও পেলেন। আশ্বস্ত হলেন, মেয়েটি প্রাণ ফিরে পাবে জেনে আর দুঃখ পেলেন তার পরিণতির কথা ভেবে। যাহোক, আল্লার যা অভিপ্রায়।

দু মাসের ভেতরেই সেবাযত্ন আর ধন্বন্তরী কবিরাজের ওষুধে সেরে উঠল রেশমী। তবে তার আগের সেই সৌন্দর্যে গড়া শরীরটা অচেনার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এ যেন আর এক রেশমী, একই জন্মে ঘটে গেল জন্মান্তর।

অগ্নিদাহের ক্ষত থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথম যেদিন রেশমী আয়নায় দেখল নিজের মুখ, সে নিজেকে চিনতেই পারল না। মনে হল, এ কোন মেয়ের মুখ ফুটে উঠেছে মায়া-দর্পণে। সে ভয়ে, দুঃখে আয়না থেকে সরিয়ে নিল তার মুখখানা। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অনর্গল অশ্রুধারা। দেহ থেকে দাহের

জ্বালা জুড়িয়ে গেল কিন্তু শুরু হল অন্য এক দহন। এ দহনে পুড়তে লাগল মন, যা বাইরে থেকে দেখা গেল না।

কিন্তু বয়সে সপ্তদশী হলে কি হবে বুদ্ধিতে আচরণে স্থির প্রকৃতির মেয়ে রেশমী। নিজের মনের গোপন দুঃখ সে ফুটে উঠতে দিল না বাইরে। রোজকার কাজের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল সে।

মোল্লা মেহেরুল্লাহের প্রথম জীবন কেটেছে বড় বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে। একটা নেশায় বুঁদ হয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ দেশান্তরে। বিশেষ করে তিনি চষে বেড়িয়েছেন সারা ভারতবর্ষ। দেশ দেখার আগ্রহে যেমন ভ্রাম্যমাণরা ঘুরে বেড়ান সে রকম কোন ইচ্ছা তাড়া করে ফেরেনি মোল্লা সাহেবকে। তাঁর এই দেশ ঘোরার পেছনে ছিল ভিন্ন ধরনের একটা উদ্দেশ্য।

তিনি যৌবনে যে মেয়েটিকে সাদি করেছিলেন সে ছিল তার বাবার একমাত্র মেয়ে। বাবা মারা যাবার পর মেয়ে তাঁর সম্পত্তি পায়। সম্পত্তির ভেতর একখণ্ড জমি আর একটুকরো চালাঘর। সেটা সম্পত্তি হিসেবে এমন কিছু লোভনীয় বস্তু ছিল না। কিন্তু যেটি ছিল অনেক বেশী মূল্যবান, তা তাঁর যত্নে লালিত অত্যন্ত শিক্ষিত এক ঝাঁক পায়রা।

সাদিক আলি সাহেব ছিলেন পারাবত বিশারদ। কত জাতের কবুতর যে সংগ্রহ করেছিলেন তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না। সারা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি যেতেন পারাবতের খোঁজে। দেশে নিয়ে এসে তিনি তাদের যত্নে প্রতিপালন করতেন। দিনে দিনে বৃদ্ধি পেত পারাবত বংশ।

সাদিক আলি সাহেব বিভিন্ন মেলায় কিংবা উৎসবে তাঁর পোষা পায়রাগুলো নিয়ে খেলা দেখাতেন।

একটা লম্বা বাঁশ পোঁতা হত খেলার মাঠে। বাঁশের মাথায় বেঁধে দেওয়া হত চতুরস্র ছতরি (ছোট ছোট বাখারি দিয়ে তৈরী মাচা)। এবার 'ব্যোম' বাঁধা হয়ে গেলে সাদিক আলি ছেড়ে দিতেন তাঁর পায়রা। হরেক রঙের পায়রা ডানা মেলে উড়ে গিয়ে বসত ঐ ছতরির ওপর।

এরপর আলি সাহেব মোটা সরু নল জুড়ে জুড়ে বাঁশে বাঁধা ছতরির তলায় খোঁচা দিতেন। একবার খোঁচা দিলে কেবল সাদা রঙের এক ঝাঁক পায়রা আকাশে উড়ে গিয়ে চক্কর লাগাত। একটা কেন্দ্র থেকে কয়েকটা আবর্ত তৈরী করে ঘূর্ণির মত ঘুরত ওরা।

এরপর ছতরিতে দুটো খোঁচা লাগালেই চিলে বা ইঁট রঙের পায়রাগুলো উড়ে গিয়ে সাদার বাইরে গেরুয়া রঙের ঘূর্ণি তৈরী করত।

কিছু সময় ওড়ার পরে ছতরিতে তিনবার খোঁচা লাগাতেন সাদিক সাহেব। অমনি নীলের আভা লাগা কালো পায়রার শেষ ঝাঁকটি উড়ত আকাশে। তারাই গড়ত সীমানার বৃত্তটি।

কাৎ হয়ে যখন উড়ত পায়রাগুলো তখন রোদ্দুর ঝিলিক দিত ডানায়।

এবার ফাটা বাঁশ ঠুকে জোর একটা আওয়াজ করলেই সাদা পায়রাগুলো টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়ত কেন্দ্র থেকে। তারা একটার পর একটা মালা থেকে খসে পড়া সাদা ফুলের মত নেমে আসত মাটিতে। এরপর দুটো, তারপর তিনটে আওয়াজ হলেই চিলে পায়রা আর কালো পায়রাগুলো নেমে আসত আকাশ থেকে।

লোকে আনন্দে চড়বড় করে হাততালি বাজাত। অমনি সাদিক সাহেব ছেড়ে দিতেন গণ্ডা পাঁচেক গ্রহবাজ পায়রা। ওরা ফটাফট পাখার ঝাপটায় হাততালির মত আওয়াজ করতে করতে অনেক উঁচুতে সিধে উঠে যেত। তারপর পাখাগুটিয়ে শূন্য থেকে পড়তে থাকত নিচে। এ সময় তারা বাজি দেখাত। এদিক ওদিক দুদিকে একটা করে প্যাঁচ মারতে মারতে নামত তারা।

এমনি কয়েকবার প্যাঁচ মেরে নেমে আসতে পারত যে সব গ্রহবাজ তাদের বলা হত 'বাজেন্দার'।

এর পরের খেলাগুলো হত মাটির ওপর তৈরী কিছুটা উঁচু বেদীতে। দর্শকেরা যাতে চারদিক থেকে ভালভাবে খেলাগুলো দেখতে পায়।

সাদিক সাহেব এবার একটা লোটন পায়রা হাতে তুলে নিতেন। মাটিতে লুটোপুটি করে খেলা দেখাতে পারে, তাই তার নাম লোটন।

লোটনকে মাটিতে লোটানো এত সহজ ব্যাপার নয়। সাদিক সাহেব পায়রা লোটানোর কায়দাটি জানতেন। বুড়ো আঙুলে চেপে ধরতেন একটি ডানা। কড়ে আঙুল আর অনামিকায় চেপে রাখতেন অন্য ডানাটি। এরপর তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুটি গলার দুপাশ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বুকে ঠেকিয়ে রাখতেন।

এবার ডাইনে বাঁয়ে কয়েকবার লোটনের মাথাটি হেলিয়ে দেওয়া হত। প্রতিবারে নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেত মৃদু ঠক্ ঠক্ একটা আওয়াজ।

এরপর ঝাঁকি দিয়ে পায়রাটিকে ছেড়ে দেওয়া হত মাটিতে। সে মাটিতে পড়ে ডিগবাজি খেত বারবার। যে পায়রা তাড়াতাড়ি লুটোপুটি খেতে পারত সেটির নাম, 'খড়কে'। আর যেটি একদমে বেশীবার লুটোপুটি করতে পারত তার নাম 'বেদম লোটন'।

এসব দর্শকদের খেলা দেখাতে দেখাতে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন সাদিক সাহেব।

শেষ খেলাটি হত ময়ূর নাচের ভঙ্গীতে।

লক্কা পায়রা বেদীর ওপব ঘুরে ঘুরে এই নাচ দেখাত। রেশমের মত উজ্জ্বল সাদা রঙের রেশমী-লক্কা তার পেখম মেলে দিত ময়ূরের মত। ঝোটন বাঁধা মাথাটি ঈষৎ কাৎ করে সে অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাঁপাতো তার গলাটি। দর্শকেরা দেখে হাততালি দিত।

রেশমী-লক্কা ঘুরে ঘুরে দেখাতো তাদের পেখম মেলা নাচ। সবশেষে একসারিতে দাঁড়িয়ে পেখম তুলে ঝুঁটিওলা মাথাটি কাৎ করে যখন ওরা গলায় কাঁপন জাগাতো তখন মনে হত, সমবেত দর্শকদের ওরা অভিবাদন জানাচ্ছে।

এই পায়রার খেলা দেখিয়ে সাদিক সাহেবের রোজগার কম হত না। কিন্তু একদিন খোদার ডাকে বিপত্নীক সাদিক সাহেবকে সব খেলা ফেলে চলে যেতে হল।

মেয়ের সুবাদে জামাই পেল মূল্যবান এক ঝাঁক পায়রার মালিকানা। যুবক মেহেরুল্লাহ প্রথম প্রথম শ্বশুরের ব্যবসাটা চালাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কিছু দিনের ভেতরেই বুঝে গেলেন কাজটা সহজসাধ্য নয়। এর পেছনে বেশ কিছুকালের মেহনত, ভালবাসা আর শিক্ষা থাকা চাই।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল শ্বশুরমশায়ের একটি কথা। সেদিন শ্বশুরবাড়ীতে তিনি কবুতরখানার পাশটিতে দাঁড়িয়েছিলেন আর সাদিক সাহেব করছিলেন পারাবতের পরিচর্যা।

কাজ থামিয়ে হঠাৎ সাদিক সাহেব বললেন, জানো বাপ, এই পায়রাতে অসাধ্যসাধন করতে পারে।

জামাই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, কি রকম ?

শেখাতে পারলে বহুদূরের খবরও বয়ে আনতে পারবে ঘবে। এমনকি দেশবিদেশে ওড়াওড়ি করে খবর লেনদেন করতেও তাদের কোন অসুবিধেই হবে না।

এটা কিভাবে সম্ভব ?

সাদিক আলী বললেন, পায়রার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, আর তাদেব সবকিছু চিনে রাখার ক্ষমতাও অবাক করে দেবার মত। ওদের এই গুণগুলো কাজে লাগাতে পারলে অনেক বড় বড় কাজ হাসিল হয়ে যেতে পারে। নবাব বাদশা, রাজারাজড়ারা তাঁদের গোপন খবরাখবর দ্রুত চালাচালি করতে পারেন এই কবুতরের মাধ্যমে।

যে কোন কবুতরই কি এ কাজ করতে পারবে ?

না, এ কাজ করতে গেলে ক্ষমতা আর শিক্ষা দুটোই থাকা চাই। আমাদের হিন্দুস্থানে নীলগিরি পর্বতে এক ধরনের পায়রা দেখা যায়, তাদের স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়েছে 'রাজ-কপোত'। আমাদের বাংলা দেশের 'বুনো গোলা' অথবা 'গ্রহবাজ'দের এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। আকারে অনেক বড়সড় আর শক্ত সমর্থ। ডানায় ভারী তাগদ। বাঁচেও বেশীদিন। ঠিকমত শেখাতে পারলে খবর লেনদেনে এরা আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাতে পারে।

মেহেরুল্লাহ নতুন খবর জানতে পেরে বেশ আগ্রহ দেখালেন। তিনি বললেন, যে জায়গাগুলো থেকে খবর লেনদেন হবে, সেগুলো কবুতরদেব নিশ্চয়ই আগে থেকে জেনে রাখা দরকার।

অবশ্যই। তবে এই শেখানোর ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।

তবু যদি শেখানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু আন্দাজ দেন।

সাদিক আলী দেখলেন, তাঁর জামাতাটি কবুতর সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। তিনি তখন সাগ্রহে বলতে লাগলেন, পাখিদের ভেতর পায়রার স্ত্রীপুরুষে ভাব ভালবাসাটি খুবই

গাঢ়। ওরা আমরণ দুজনে একসঙ্গে থাকতে ভালবাসে। তাছাড়া যে অঞ্চলে এবং যে বাসায় ওরা থাকে তার ওপর ওদের টান খুবই প্রবল।

মেহেরুল্লাহ বললেন, শুনেছি জোড়া পায়রা এক খোপে বাস করলে কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে চায় না।

সাদিক সাহেব বললেন, পায়রার এই দুটি গুণকে কাজে লাগাতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

কি রকম, যদি আর একটুখানি স্পষ্ট করে বলেন।

ঐ যে বললাম, বাসস্থান আর বউয়ের ওপরে টান। ওকে যত দূরেই নিয়ে যাও, ও ঠিক পথটি চিনে উড়ে আসবে তার আপন ঘরে। অবশ্য প্রথমে তাকে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে নিয়ে যেতে হবে খাঁচায় কোনরকম ঢাকা না দিয়ে। সে পথের গাছপালা, নদীনালা একবারেই চিনে নেবে। তারপর আর কোনদিন তার যাতায়াতে অসুবিধে হবে না।

শ্বশুরমশায় মারা যাবার পরে মেহেরুল্লাহ পায়রার খেলা দেখানোর ব্যাপারে বিশেষ জুৎ করতে পারলেন না। তখন তাঁর ঝোঁক চাপল, কিছু রাজকপোত যোগাড় করে খবর আদান প্রদানের একটা ব্যবসা চালানোর।

সারা যৌবনকাল সে কাজে তিনি ব্যয় করলেন। সফলও হলেন তাঁর সেই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে। হিন্দুস্থানের সবকটি দুর্গ, রাজধানী, নগরী তিনি ঘুরলেন অশ্বারোহণে, সঙ্গে সারা-ক্ষণের সঙ্গী সেই পারাবতকুল।

একসময় আরাকান এবং সিংহলেও গেলেন তিনি উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে। প্রতিটি জায়গায় নিযুক্ত হল স্থানীয় কোন অধিবাসী। কথা রইল তারা সারা বছর তাদের গৃহের শীর্ষে একটি উড়ন্ত পারাবতের দারু-মূর্তি গুঁজে রাখবে। ঐ মূর্তিটি ঠিক খুঁজে নেবে তাঁর শিক্ষিত পায়রা। পালকে আঠা দিয়ে লাগান হাল্কা চিঠিখানা খুলে নেবে প্রাপক, তারপর উপযুক্ত উত্তর সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবে অনুরূপভাবে। পাখির পায়ে পরানো নকল রঙে ঢাকা দুটি সোনার রিং হবে খবর-প্রেরকের পুরস্কার।

মেহেরুল্লাহ সাহেবও একদিন প্রবীণ হলেন। তাঁরও পত্নী

গত হলেন একটিমাত্র কন্যা রেখে। কন্যাটি উপযুক্ত হলে বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি তাকে পাত্রস্থ করলেন। কিন্তু সে বন্ধন দীর্ঘদিন অটুট রইল না। তালাক পেয়ে মেয়ে ফিরে এল বাবার ঘরে। সেই থেকে বাবার সঙ্গে পায়রাগুলিরও পরিচর্যা করে আসছে আমিনা।

এখন মেহেরুল্লাহ সাহেব তাঁর নিজের অর্থে তৈরী ছোট্ট সুন্দর মসজিদটির ইমাম। এক বৃদ্ধ ফকির এক সময় এসেছিলেন তাঁর কাছে। অনেক গূঢ় তত্ত্বকথা আলোচনা হয়েছিল দুজনে। তারপর মেহেরুল্লাহ সাহেব আর ফিরে যেতে দেননি ফকিরকে। যতদিন ফকিব সাহেব জীবিত ছিলেন ততদিন মেহেরুল্লাহ তাঁকে ডাকতেন পীরবাবা বলে। পবে তাঁর কথা স্মরণ করে একটি দবগা নির্মাণ করেন। বিশেষ তিথিতে বহু ভক্ত জড়ো হন এখানে। পীরের দরগায় শুদ্ধ চিত্তে মানত করলেই পূর্ণ হয় মনস্কামনা।

রেশমী অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠলে একদিন তাকে কাছে ডাকলেন মেহেরুল্লাহ সাহেব। অত্যন্ত কোমল স্ববে বললেন, কেমন কাছ মা ?

রেশমী মাথাটা ঈষৎ নত কবে বলল, ভাল আছি বাবা।

তুমি যতদিন বিছানায় ছিলে মা, আমি কোন কিছু প্রশ্ন করতে বারণ কবেছিলাম আমিনাকে। এখন তুমি আল্লার কৃপায় সুস্থ হয়ে উঠেছ, তাই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

রেশমী তার বড় বড় দুটি চোখ মেলে এবার সোজা তাকাল তার দয়ালু আশ্রয়দাতার দিকে।

মেহেবুল্লাহ বললেন, মানুষ যখন অসুস্থ থাকে তখন সে অসহায়। কোন ধর্মের শাসনেই তাকে বাঁধা যায় না। একমাত্র সেবাধর্মের ছোঁয়ায় তার হারানো শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হয়। তুমি মা বড় অসুস্থ আর অসহায় অবস্থায় আমার আস্তানায় এসে পড়েছিলে। তখন তোমার কি ধর্ম সে কথা জানার কোন সুযোগ ছিল না। এখন তুমি সুস্থ হয়েছ, তোমার সব রকম পরিচয় আমার জানা দরকার। আমি তোমাকে তোমার বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি।

রেশমী বলল, আমি এখানে থেকে আপনার কি খুব অসুবিধের কারণ হচ্ছি বাবা ?

মেহেরুল্লাহ সাহেব বললেন, একথা বলছ কেন মা। তুমি আছ তাই আমার আমিনা যেন মস্ত বড় একটা অবলম্বন পেয়ে গেছে। স্বামীর কাছ থেকে তালাক পাবার পর ওর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়েছিল, এখন তোমার সঙ্গ পেয়ে তা আবার ফিরে এসেছি। তুমি থাকলে আমার ঘরে আনন্দ হাসিখুশী সবই থাকবে, কিন্তু তোমাকেই বা নিজেদের স্বার্থে কতদিন বাড়ি ছাড়া করে রাখি বল ?

রেশমী সামান্য সময় নীরব থেকে কিছু ভাবল। একসময় শান্ত গলায় বলল, আমি কোন্ ধর্মের মানুষ তা আজও জানি না। আমার বাবা জাতিতে পর্তুগীজ। চিকিৎসক ছিলেন তিনি। ধর্মে খ্রীস্টান। আমার মা ছিলেন হিন্দুদের মন্দিরের এক দেবদাসী, নর্তকী। আর আমি এখানে আসার আগে ছিলাম মুসলমানের হারেমে। সেখানে নাচগান করে মালিককে আনন্দ দেওয়াই ছিল আমার একমাত্র কাজ। এখন আপনিই বলুন বাবা আমার জাতিধর্ম কি ?

আমিনা আড়াল থেকে শুনতে পাচ্ছিল ওদের কথাগুলো, সে এবার এগিয়ে এল। রেশমীর কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে উঠল, রেশমীর ভেতর সব ধর্মেরই ছোঁয়া লেগেছে বাবা, তাই বিশেষ কোন একটা ধর্মে ওকে বেঁধে রাখা যাবে না। ও আমার বোন। যতদিন খুশি ও আমার কাছেই থাকবে।

মেহেরুল্লাহ সাহেব হেসে বললেন, সে তোমরা দু'বোনে ও নিয়ে বোঝাপড়া কর। কিন্তু মা, আমার যে আরও দু'একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। একে প্রশ্ন না বলে বরং কৌতূহল বলতে পার।

ততক্ষণে রেশমীর হাতখানা আমিনার হাতের মুঠোয় বাঁধা পড়েছে।

কি জানতে চান বলুন বাবা ?

মেহেরুল্লাহ বললেন, তোমার বাবা আর মায়ের কথা কিছু আমি জানতে চাই। তুমিই বা তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কি করে ?

বেশ খানিক সময় নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল রেশমী। একটা ব্যথার জায়গায় নরম কোন প্রলেপ দিতে গেলেও যেমন হঠাৎ ব্যথাটা টনটনিয়ে ওঠে রেশমীর ভেতরেও তেমনি এক ধরনের আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

আমিনা রেশমীর মনের অবস্থাটা আঁচ করে তাকে হাত ধরে একটা বেদীর ওপর বসাল। নিজেও বেশ ঘন হয়ে বসল তার পাশে। মেহেরুল্লাহ সাহেব আগেই বসেছিলেন মসজিদ সংলগ্ন একটা রোয়াকের ওপর।

সমস্ত জায়গাটি বড় বড় গাছের জটলায় ছায়াচ্ছন্ন। ডালপাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছিল শেষ বেলার সোনালী আলো। গাছের কাণ্ড আর লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল বয়ে চলা গঙ্গার ঝিলিক। ছপ্ ছপ্ দাঁড় টেনে উজানে উঠছে নৌকো। আবার কোনটি বা ভেসে চলেছে ভাটার টানে।

নীরবতা ভেঙে রেশমী কথা বলল, আমার কাহিনী অনেক বড়। কিছু মা বাবার মুখ থেকে শোনা, বাকিটা আমার নিজের দেখা, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানা।

প্রথমে বাবার কথা দিয়েই শুরু করা যাক। দেশ দেখার আগ্রহ নিয়েই তিনি দেশ ছেড়েছিলেন। বৃত্তিতে চিকিৎসক তাই চলার পথে আহার, বাসস্থান কোন কিছুরই অভাব হত না।

প্রথমে ভারতের পশ্চিম উপকূলে নেমেছিলেন একটা পণ্যবাহী জাহাজে সমুদ্র পেরিয়ে এসে। তারপর পায়ে হেঁটে মানুষজন দেখতে দেখতে এদেশের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন।

মন্দির, মসজিদ, দুর্গ দেখে তিনি অবাক হলেন। মুগ্ধ হলেন সাধারণ মানুষের অতিথি সেবা দেখে।

একদিন বহুপথ পেরিয়ে তিনি এলেন সমুদ্র তীরের একটি মন্দিরে। মানুষের বসতি থেকে বেশ খানিক দূরে মন্দিরটি। মাঝে মাঝে নগর থেকে রাজা আসতেন শিবিকায় চেপে। সঙ্গে আসতেন পারিষদেরা। সেদিন হত বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান। পূজা শেষে নাচ হত দেবদাসীর। পারিষদদের নিয়ে রাজা নাটমণ্ডপে বসে সে নাচ বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন।

রসিকতাও চালাতেন ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে। রাত যত গভীর হত রাজার উপভোগের মাত্রাও সীমা ছাড়িয়ে যেত।

পড়ন্ত বেলায় সেদিন বাবা মন্দিরটির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পেছনে দিগন্ত ছুঁয়ে নীল সমুদ্র।

মায়ের মুখে শুনেছি, বাবাকে সেদিন দেখে মনে হচ্ছিল, ভগবান যেন কোন দেবদূতকে স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই পৃথিবীতে।

মন্দিরের ভেতর থেকে বাবাকে দেখতে পেয়েছিলেন আমার মা। বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু সে ভাল লাগার কথা প্রাণ খুলে কাউকে বলা সম্ভব ছিল না একজন দেবদাসীর। মন্দিরের দেবদাসী কেবল দেবতারই দাসী। পাথরের মূর্তির কাছেই তাকে নিবেদন করা হয় তরুণী বয়সে। যখন সে নাচে গানে একেবারে পারদর্শিনী হয়ে ওঠে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই থাকে না।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে থামল রেশমী।

আমিনা বলল, তোমার কাহিনীর শুরুতে কিন্তু বেশ একটা চমক আছে।

রেশমী বলল, আমিনা দিদি, সমস্ত জীবনটাই আমার চমকে ভরা। শুনলে তোমার গল্পকথা বলে মনে হবে।

মেহেরুল্লাহ সাহেব বললেন, মা, এখন নামাজের সময় হয়ে গেছে, আমি উঠছি। তোমরা দুটি বোনে গল্প কর, পরে আমি আমিনার কাছ থেকে যা জানবার জেনে নেব।

মেহেরুল্লাহ উঠে গেলেন। আমিনা বলল, তোমার কষ্ট না হলে এবার কাহিনীটা শুরু করতে পার।

রেশমী বলল, কষ্টের কথা কি বলছ আমিনা দিদি, কষ্ট তো আমার কপালে তিলক এঁকে দিয়েছে। এ দাগ সহজে মোছার নয়। বলতে পার সারা জীবনের সঙ্গী।

একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে রেশমী শুরু করল তার কাহিনী, আগেই তোমাকে বলেছি, মন্দিরটি সমুদ্রের তীরে। মন্দিরের পেছনে বালির পাহাড়। তার কোল জুড়ে বিস্তীর্ণ বাদামের বন। মন্দিরে থাকেন এক দেবদাসী আর এক বৃদ্ধ

পুরোহিত। রাজা ছাড়া সেই নির্জন মন্দিরে জনসাধারণের আসা নিষিদ্ধ ছিল। পরিত্যক্ত স্থান আর বনবাদাড় দেখে নাগরিকরা এদিকে পা বাড়াতেন না। তাছাড়া পথেরও কোন চিহ্ন ছিল না বনের ভেতর দিয়ে।

আমিনা বলল, তাহলে ঐ দুর্গম জায়গাটিতে রাজাই বা আসতেন কেন? লোকালয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেক মন্দির ছিল, সেখানে সহজেই রাজা যেতে পারতেন। তবে কি দেবদাসীর নাচ দেখার আগ্রহেই ঐ মন্দিরে আসতেন তিনি।

রেশমী বলল, এমন একটি কথাই ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু মায়ের মুখে শুনেছি, ঐ রাজার এরকম আরও অন্ততঃ তিনটি মন্দির ছিল যেখানে একের বেশী দেবদাসী নৃত্যগীত করত।

তাহলে ঐ নির্জন বনে ঘেরা পরিত্যক্ত সমুদ্র তীরের মন্দিরে কি কারণে রাজা আসতেন বলে তুমি মনে কর?

মনে করার কিছু নেই আমিনা দিদি, আমি জানি কেন তিনি আসতেন। আর তাঁর আসার কারণটা আমি মায়ের কাছ থেকেই জেনেছিলাম।

কারণটা জানার জন্য আমিনা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে রেশমী বলল, রাজারা সাধারণতঃ তাঁদের ধনরত্নের বেশ কিছু অংশ মন্দিরে গচ্ছিত রাখাই নিরাপদ বলে মনে করেন। ঐ রাজাও প্রায় পরিত্যক্ত মন্দিরটির বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে তাঁর অনেক মূল্যবান রত্ন জমা রাখতে আসতেন। কখনো বা নিয়ে যেতেন বিশেষ প্রয়োজন পড়লে।

আমিনা বলল, এবার সব কিছু পরিষ্কার হল। এখন তোমার বাবার কথা বল শুনি। সেই যে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

রেশমী বলল, সারাদিন পথ চলে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত মানুষটি একটু আশ্রয় চাইলেন রাতের মত। কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর করলেন না তাঁর প্রার্থনা পূরণ। তিনি নাকি মাকে বলেছিলেন, অজ্ঞাত-কুলশীলকে আশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই মার প্রাণে বেজেছিল। তিনি মন্দিরের ভেতর থেকেই লক্ষ্য করছিলেন বিদেশী মানুষটির গতিবিধি।

মা এক সময় দেখলেন, লোকটি পাশে বালিয়াড়ির দিকে চলে গেলেন। অল্প সময়ের ভেতরেই সূর্য সমুদ্রের জলে ডুবে গেল সিঁদুর গুলতে গুলতে। দিনের আলো মুছে গে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আর একটা আলো। পূর্ণিমার চাঁদটা ঝকঝকে রুপোর থালার মত জেগে রইল নীল আকাশের বুকে।

বিশেষ পুজা ছিল সে রাতে। রাজা এলেন কয়েকজন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে। দুটি শিবিকার একটিতে এসেছিলেন রাজা, অন্যটিতে ছিল একটি বড়সড় ভারী সিন্দুক। সেই সিন্দুকটি রাখা হল গর্ভ গৃহের মধ্যে। বাহকদের ভেতর প্রচার করা হয়েছিল, সিন্দুকে ভরে আনা হয়েছে নতুন একটি শিবলিঙ্গ। আসলে তার ভেতর ঠাসা ছিল হিরে জহরত। রাজকোষের শ্রেষ্ঠ ধনসম্পদ সেদিন বয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল ঐ ভাঙা মন্দিরে।

আমিনা বলল, রাজা একদিনে এত ধনসম্পদ ঐ মন্দিরে এনে তুললেন কেন?

রেশমী বলল, তোমার মনে ঠিক প্রশ্নটি জেগেছে। আসলে কয়েকদিন আছে গুপ্তচরের মুখ থেকে তিনি একটি উড়ো সংবাদ শুনেছিলেন।

রেশমী একটুখানি থামলে আমিনা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি সংবাদ?

প্রবল কোন দস্যুর দল রাজভাণ্ডার লুঠ করতে পারে। সত্য হোক্, মিথ্যে হোক্ রাজা কোন ঝুঁকি না নিয়ে সরিয়ে ফেললেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি।

আমিনা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, দস্যুর দল কি এসেছিল?

এসেছিল, তবে রাজার প্রাসাদে নয়।

তাহলে কোথায়?

রেশমী বলল, তার আগে শোন সেই বিদেশী মানুষটির কথা।

সে রাতে রাজা যথাস্থানে হিরে জহরত গচ্ছিত রেখে চলে যাবার পর বৃদ্ধ পুরোহিত সামান্য আহার করে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে দয়াবতী দেবদাসী কিছু খাবার আর পানীয় সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিদেশী মানুষটির খোঁজে। তাঁর নিশ্চিত ধারণা

হয়েছিল, মানুষটি বালু-পাহাড়ের ওপারে সমুদ্রের ধারে তাঁর রাতের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন।

সেদিন জ্যোৎস্না ঝরা রাতে নির্জন সমুদ্র তীরে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই ভিনদেশী নারী পুরুষ একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পরের ভাষা জানতেন না, তবু পরস্পরের হৃদয়ের ভাষার কথা বলতে কোন অসুবিধেই হয়নি তাঁদের।

মন্দিরের দেবদাসীর আকর্ষণে তিনদিন আত্মগোপন করে ঐ বালিয়াড়ি আর বাদাম জঙ্গলে কাটিয়ে দিলেন বিদেশী মানুষটি। দেবদাসীও আকুল হলেন মন্দির ছেড়ে চলে যাবার জন্য। কিন্তু দুজনেই এমন কোন উপায় আবিষ্কার করতে পারলেন না যাতে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।

অন্তরের তাগিদ গভীর হলে সম্ভবত উপায় আপনিই এসে হাজির হয়। হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যা ওঁদের ভাবনার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। দুজনে বসেছিলেন বালিয়াড়ির কোলে সমুদ্রের ধারে। হঠাৎ ওঁদের চোখে গিয়ে পড়ল একটা আলোর বাতির ওপর। অন্ধকারে আলোটা কয়েকবার ওঠানামা করল। তারপর মনে হল জঙ্গলের দিকে দ্রুত সরে সরে চলে যাচ্ছে। একসময় হঠাৎ হারিয়ে গেল।

ওঁরা অনুমান করলেন, এটি আলেয়ার আলো। অথবা ওদিকে সমুদ্রের খাঁড়িতে কোন জেলে-নৌকা ঢুকে পড়ে মাছ ধরছে।

রাত বাড়ছিল। দেবদাসী চলে গেলেন নিজের আস্তানায়। বিদেশী পথিক বালির বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

ঘুম ভেঙে গেল একটা আর্ত চিৎকারে। কোন মেয়ের গলার আওয়াজ বলে মনে হল। বিদেশী লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সপ্তমীর চাঁদ তখন অনেকখানি অন্ধকার মুছে দিয়েছে। রাতের সেই মায়াময় আলোতে তিনি দেখলেন, একটু দূরে সমুদ্রে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে একটি জাহাজ। কালো বিশাল একটা জলচর প্রাণীর মত মনে হচ্ছে তাকে। তীরের কাছে দুটো নৌকো সামলাচ্ছে কয়েকটি মানুষ। কালো কালো দশ বিশটা মূর্তি মন্দির থেকে কি যেন বয়ে নিয়ে এসে নৌকোতে তুলল। যে

চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিদেশীর সে আওয়াজ দ্বিতীয়-বার শোনা গেল না।

বিদেশী মানুষটি মুহূর্তে বুঝে নিলেন মন্দির লুণ্ঠন করতে এসেছে কোন জলদস্যুর দল। রাজার অতি ঘনিষ্ঠ কেউ হয়তো বহু অর্থের লোভে হার্মাদদের এই রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিয়ে থাকবে। হঠাৎ মনে হল, অন্ধকারের ভেতর যে আলোটা দেখা গিয়েছিল সেটা আলেয়ার আলো নয়, জাহাজকে কেউ সাংকেতিক আলো দেখাচ্ছিল।

বিদেশী কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মীনাক্ষি, ম নাক্ষি বলে চিৎকার করতে করতে ছুটলেন নৌকোগুলো লক্ষ্য করে।

রেশমী একটুখানি থামল এখানে। অমনি আমিনা বলল, নিশ্চয়ই মীনাক্ষি নামটি তোমার মায়ের।

হাঁ আমিনা দিদি, ঐ নামটিই মন্দিরের দেবদাসীর, যিনি আমার মা।

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমিনা বলল, এখন বল সেই বিদেশী পথিক আর দেবদাসীর কাহিনী।

রেশমী বলতে লাগল, বিদেশী ঠিকই অনুমান করেছিলেন দেব-দাসীকে মুখ বেঁধে নৌকোতে তোলা হয়েছে। সিন্দুক ভর্তি রত্নও তোলা হয়েছে সেই সঙ্গে।

বিদেশী মানুষটি ছুটে এসে নৌকোর একটা মাঝির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ঐ নৌকোর পাটা-তনের ওপরেই মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তাঁর ভালবাসার নারী।

একসঙ্গে কয়েকটি তলোয়ার শূন্যে উঠল বিদেশী মানুষটিকে খণ্ড খন্ড করে ফেলার জন্য। হঠাৎ পাশের এক নৌকো থেকে চিৎকার করে উঠল এক হার্মাদ, খবরদার। আঘাত করনা ওকে, শুধু বন্দী করে রাখ। মনে হচ্ছে লোকটা আমাদেরই দেশের।

কিন্তু তখন বিদেশীর গায়ে অসুরের বল। তাঁকে যারা ধরতে এসেছিল তাদের দু'তিনজনকে ধরে তিনি শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সমুদ্রে। পাশের নৌকোর সেই হার্মাদ মাঝিটি তখন একটা

দাঁড় তুলে আঘাত করল শক্তিমান সেই মানুষটির মাথার পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন পাটাতনের ওপর।

থামল রেশমী। হয়তো পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুতি।

আমিনা বলল, দেবদাসী কি তখন মুখ বাঁধা অবস্থাতেই পড়ে ছিলেন নৌকোতে?

হ্যাঁ, তিনি কথা বলতে পারছিলেন না ঠিক কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলেন সবকিছু। তাঁর প্রাণের মানুষটি যখন পাটাতনের ওপর পড়ে গেলেন তখন তিনি মনের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

নৌকো ছেড়ে দিল। জাহাজটার দিকে এগিয়ে চলল দুটো নৌকো ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে।

ইতিমধ্যে ঐ অঞ্চলের তিনটি মানুষ এসে উঠেছিল নৌকোতে। তারাও চলল কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে। আশ্চর্য! দেবদাসী কিন্তু ওদের ভেতর একজনকে চিনতে পারলেন। মহারাজের সঙ্গে এই বয়স্যটি প্রায়ই আসত মন্দিরে। তাহলে কি রত্নভাণ্ডারের গোপন খবরটা অর্থের লোভে এই মানুষটাই হার্মাদদের হাতে তুলে দিয়ে ছিল।

নৌকো এসে ভিড়ল জাহাজের গায়ে। সবাই উঠল জাহাজে। দেবদাসী আর বিদেশী মানুষটিকে ধরাধরি করে তোলা হল।

কিছুক্ষণ পরে নাবিকের ঘরের ভেতর থেকে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। দেবদাসী পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। তবে অনুমানে আর এক পক্ষের ভাষা শুনে যেটুকু বুঝলেন তাতে মনে হল, পাওনা গণ্ডা নিয়ে বিবাদ লেগেছে আগন্তুক তিনজনের সঙ্গে।

শেষে নাবিক ওদের সম্ভবত দুটো পথের ভেতর একটাকে বেছে নিতে বললেন। দাস হয়ে চালান যেতে হবে বিদেশে, নয়তো তাদের ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে সমুদ্রে। ভাগ্য ভাল থাকলে সাঁতার কেটে তীরে উঠবে, নয়তো খাবার হয়ে ঢুকবে হাঙরের পেটে।

আমিনা সবিস্ময়ে বলল, তারপর! সত্যিই কি ওদের দাস-দাসীর হাটে বেচবে বলে ধরে নিয়ে গেল, না জলে ফেলে দিলে?

রেশমী বলল, তিনজনকেই ধাক্কা মেরে সমুদ্রের জলে ফেলে

দেওয়া হল। অল্প সময়ের ভেতরেই প্রবল ঢেউয়ের তোলপাড়ে ওরা তলিয়ে গেল অতলে।

এরপর চারখানা ধবধবে সাদা পাল তুলে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তেজী ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল জাহাজখানা।

মুখ খুলে দিয়েছিল দেবদাসীর, হাতের বাঁধনও। কিন্তু তাঁকে রাখা হয়েছিল একটা কুঠুরিতে, বাইরে থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল শেকল।

সব রকম ব্যবস্থাই ছিল ঘরের ভেতর। একটা জানালাও ছিল সমুদ্রের দিকে খোলা। ভোর হল, আলো ফুটল। বেলা বেড়ে চলল ধীরে ধীরে। দেবদাসীর মন অস্থির হয়ে উঠল।

কথার ভেতর ছেদ ফেলল রেশমী।

আমিনা বলল, দেবদাসীর অস্থিরতা নিশ্চয়ই সেই বিদেশী মানুষটির জন্য।

অবশ্যই। জ্ঞান হারানোর পর মানুষটির কি হল তা জানাব কোন রকম উপায় ছিল না দেবদাসীর। তাই উদ্বেগের সীমা ছিল না তাঁর।

হঠাৎ একসময় বাইরের শেকলটা শব্দ করে খুলে গেল। একজন বিদেশী মাল্লা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। ইঙ্গিতে সে দেবদাসীকে তার সঙ্গে আসতে বলল।

এরপর কি ঘটতে পাবে সেটা অনুমান কর তো আমিনা দিদি।

আমিনা বলল, তা আমি কি করে বলব ভাই! তবে অঘটন যে কিছু ঘটেনি তা তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

রেশমী বলল, তোমার বুদ্ধি আর বিবেচনার কাছে হার না মেনে উপায় নেই। তবে কি ঘটেছিল তাই শোন।

দেবদাসীকে নিয়ে যাওয়া হল নাবিকের ঘরে। সেখানে নাবিকের পাশে আর একজনও বসেছিলেন।

আমিনা অমনি বলল, নিশ্চয়ই সেই বিদেশী মানুষ।

হ্যাঁ। তাঁর মাথায় কিছু ওষুধ লাগিয়ে এক ফালি কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু দেবদাসীকে দেখে খুশী হয়ে উঠলেন। দেবদাসীর মুখেও ফুটে উঠল নিশ্চিন্ততার হাসি।

হার্মাদ সর্দার তাঁর স্বদেশীয় মানুষটির সঙ্গে আগেই কথা বলে রেখেছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন, লিসবনের অধিবাসীটি একজন দক্ষ চিকিৎসক এবং তিনি এই দেবদাসীটিকে ভালবাসেন, তখন একটি শর্ত রাখলেন তাঁর কাছে।

রেশমী এবার কথায় ছেদ ফেলে হাসিমুখে চুপ করে চেয়ে রইল আমিনার দিকে। উদ্দেশ্য, আমিনা দিদি অনুমান করুক শর্তটা।

আমিনা রেশমীর মনোভাবটি ধরতে পেরে বলল, দস্যু সর্দার নিজের দেশের মানুষ জেনে চিকিৎসককে ক্ষমা করে দিলেন। আর যেহেতু দেবদাসী তাঁর ভালবাসার পাত্রী তাই তাঁকে তুলে দিলেন ঐ হেকিম সাহেবের হাতে।

বেশমী বলল, ব্যাপাবটা যদি এত সহজে মিটে যেত তাহলে শর্ত দেবার কোন অর্থই থাকত না।

তাহলে তুমিই ঘটনাব জট খুলে দাও ভাই।

রেশমী বলল, দস্যু সর্দারেব এলাকাটি ছিল চট্টগ্রামে। ঐ অঞ্চলটিতে আরাকান রাজের এক সুবাদার নিযুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদার সাহেবকে শাসনেব কাজে সাহায্য করতেন ঐ হার্মাদ দস্যু। পর্তুগীজ গোলন্দাজদের সরবরাহ করতেন তিনি।

এর পরিবর্তে পাঁচশো ফিরিঙ্গি পরিবার আশ্রয় পেয়েছিল সেখানে। তাছাড়া জলদস্যুরা বাংলাদেশ থেকে যেসব হতভাগ্য মেয়ে পুরুষকে ধরে আনত তারাও থাকত সেখানে সাময়িকভাবে ডেরা বেঁধে। তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। কোন কোন সময় দশ থেকে পনেরো হাজারও ছাড়িয়ে যেত।

এই সব মানুষের খাওয়া পরার তেমন কোন সমস্যা ছিল না। আসল সমস্যা ছিল উপযুক্ত চিকিৎসার। একটা কিছু মহামারি শুরু হলেই শয়ে শয়ে মারা যেত মানুষগুলো।

তাই হার্মাদ সর্দার চিকিৎসককে বলেছিলেন, আমি তোমার স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেক্ষেত্রে তোমাকে একাই যেতে হবে। আর তুমি যদি ঐ নর্তকী মেয়েটিকে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাও তাহলে চিরদিনের মত ডেরা বেঁধে থাকতে হবে চাটগাঁয়ে। চিকিৎসা করবে আমার মানুষজনের। তোমার কোন অভাবই থাকবে না।

রেশমী থামলে আমিনা বলল, বলাই বাহুল্য হেকিম সাহেব দেবদাসীটিকে শাদি করে সানন্দে থেকে যেতে রাজি হয়ে গেলেন।

রেশমী বলল, ঠিক তাই। এবার দেবদাসী দস্যু সর্দারের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, শুনেছি নাচে গানে তোমার ভারী দক্ষতা। রোমের বাজারে তোমাকে বেচে দিলে দাম উঠবে অনেক। আর তাছাড়া ওখানে যে ধনী মানুষ তোমাকে কিনবে, তার কাছে তোমার খাতিরও কিছু কম হবে না।

একটু থামলেন হার্মাদ সর্দার। দেবদাসীর মুখে ততক্ষণে ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে।

সেটুকু লক্ষ্য করে দস্যুসর্দার বললেন, তুমি কি মনেপ্রাণে এই চিকিৎসকটিকে ভালবাস ?

দেবদাসী মাথা নত করে তাঁর মৌন সম্মতিটুকু জানালেন।

তখন হার্মাদ সর্দারের সহযোগিতায় চট্টগ্রামেই থেকে গেলেন তাঁরা ঘর বেঁধে।

আমিনা বলল, কিন্তু তুমি সেখান থেকে কি করেই বা মুসলমানের হারেমে ঢুকলে ? বড় কৌতূহল হচ্ছে জানার।

রেশমী বলল, জীবনের সে এক অন্য অধ্যায় দিদি। সে যেন দুঃখের এক নদী, যার ওপর দিয়ে আমার জীবনের নৌকোটা ভেসে চলে যাচ্ছে। আজ থাক, অন্য কোন একসময় শোনাব সে কাহিনী।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছিল। পাখিরা যে যার রাতের আস্তানায় ফিরে এসে কলরবে মাতিয়ে তুলেছিল বনভূমি। আমিনার চমক ভাঙল। মনে পড়ে গেল পীরের দরগায় জ্বেলে দিতে হবে সন্ধ্যার বাতি। সংসারের অনেকগুলি কাজ এখনও সারা হয়নি। সে উঠে দাঁড়াল।

রেশমী বলল, আমি এখন পায়রার ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি, এমনিতে আজ গল্পে গল্পে বেশ খানিকটা দেরী হয়ে গেছে।

আজকাল পায়রার তদারকির অনেকখানি ভার পড়েছে রেশমীর ওপর। রোজ খুপ্‌রি ঘরগুলো সে ঝেড়ে পুঁছে রাখে। দানা ছড়িয়ে দিয়ে খাবার জলের পাত্রগুলো ভরে দেয়।

ভোরবেলা আজান ডেকে, নামাজ পড়েন মেহেরুল্লাহ সাহেব। তারপর একসময় নাস্তা সেরে কবুতরদের আস্তানায় এসে দাঁড়ান। রেশমীকে নানাধরনের পায়রার নাম শেখান। তাদের স্বভাব চরিত্র আর কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে থাকেন একে একে। রেশমী তার বাবাসাহেবের সব কথা শোনে গভীর আগ্রহ নিয়ে।

মেহেরুল্লাহ একটি খুপরির সামনে এসে দাঁড়ালেন। রেশমীকে বললেন, একই জাতের পায়রা এরা, রংয়ে কেবল তফাৎ। এদের বলে, সিরাজু। আকারে বড়, বেশ শক্ত সমর্থ। প্রকৃতিটা গম্ভীর। কাল, লাল, ধূসর, তিন রকম রংয়ের সিরাজু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখানে।

রেশমী বলল, হাঁ বাবাসাহেব। কিন্তু বুকে আর পেটের দিকে সাদা রঙও দেখতে পাচ্ছি।

ঠিক ধরেছিস বেটী। এটা হল সিবাজুর বৈশিষ্ট্য। ঐ দেখ, কাল আর লাল সিরাজু দুটোর ঠোঁটের গোড়া থেকে চোখের পেছন দিয়ে ঘাড়, পিঠ, ডানা হয়ে পুচ্ছ অবধি এক রঙেব টান। আবার ওদের নিচের দিকটা লক্ষ্য কর। নিচের ঠোঁটের একেবাবে নিচের অংশ থেকে গলা, বুক, ডানার তলা, পেট আর পুচ্ছেব তলা ধবধবে সাদা। দেখতে খুব সুন্দর না ?

রেশমী বলল, ভারী সুন্দর।

মেহেরুল্লাহ বললেন, ভাল করে তাকিয়ে দেখ মা, কালো পায়রাটা নিছক কালো নয়। ঘোর নীল রঙেব সঙ্গে কালো আর সবুজ মেশা। কেমন চেকনাই ঝিলিক মারছে পায়রাটার গায়ে।

তাইতো বাবা, আমি এতটা লক্ষ্য করিনি।

আবার এই যে দেখছিস ধূসর রঙের সিরাজু, এটা কাশ্মীরী সিরাজু। এদের বুকে, পিঠে, ডানার পালকে দেখ, কেমন সাদা আর বেগুনি বিন্দু বিন্দু দাগ।

একটু থেমে বললেন, গুলদার সিরাজুটা দেখছি এখানে নেই। ওপরে চবুতরায় বসে আছে। এক রঙের ওরা, কিন্তু বুকে আর পেটে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের একটি করে পালক। খাসা বাহারী পাখি।

রোজ এমনি কবুতরের ওপর পাঠ দেন মেহেরুল্লাহ সাহেব। রেশমী আগ্রহ ভরে শোনে।

মাঝে মাঝে দু'একজন মান্যগণ্য লোক এসে হাজির হন। হাঁক পাড়েন বাইরে দাঁড়িয়ে,—মোল্লা সাহেব বাড়ী আছেন?

মেহেরুল্লাহ ভেতর থেকে মানুষটিকে দেখে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে বলেন, কি সৌভাগ্য, মিয়া সাহেব যে! আসুন, আসুন। ওরে আমিনা, দাওয়ায় মাদুর পেতে দে।

মিয়া সাহেব আর মোল্লাসাহেবের ভেতর কথা হয়। মুর্শিদাবাদে বোনঝির শাদির ব্যাপারে যেতে চান মিয়া সাহেব। কিন্তু এত দূরের পথ বলে তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইছেন না বিবিরা। তাই তিনি পীর বাবার আস্তানায় এসেছেন সিন্নি মানত করতে। তাছাড়া আর একটি উদ্দেশ্যও আছে। একটি পারাবত সঙ্গে নিয়ে যেতে চান তিনি। বিবিদের কাছে তাঁর পেঁছিনোর খবরটি যাতে সত্বর পাঠানো যায়, তাই এ আর্জি।

পীরের দরোগায় ক্রিয়া কর্ম শেষ হলে মোল্লাসাহেব হাঁক পেড়ে বললেন, নিয়ে এসো তো মা রেশমী একটা 'মহাদুম' পায়রা। পুরুষটাকে এনো।

কিছুক্ষণের ভেতরেই বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে একটি কালো রঙের পায়রা এনে হাজির করল রেশমী।

মেহেরুল্লাহ সাহেব হেসে বললেন, দেখ পাগলীর কাণ্ড। আনতে বললাম, 'মহাদুম' আর এনে দিল 'তাদুম'। দেখছ না, এই কালো পায়রাটার পুচ্ছে একটি মাত্র সাদা পালক। মহাদুম-গুলোর রঙও এমনি কালো কিন্তু পুচ্ছের পালকগুলোর অনেক কটাই সাদা।

রেশমী মৃদু গলায় বলল, মহাদুমের পুরুষটা মনে হয় চবুতরায় চরতে গেছে, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি বাবা!

রেশমী চলে গেলে মিয়া সাহেব বললেন, কই এ মেয়েটিকে তো আগে কখনো দেখিনি মোল্লা সাহেব।

মেহেরুল্লাহ বললেন, বড় দুঃখী, গঙ্গার ধারে পড়েছিল, আমার মেয়ে আমিনা ওকে তুলে এনেছে।

দুজনের কথার ভেতরে পায়রা এসে গেল।

হ্যাঁ, এটাই চেয়েছিলাম। মুর্শিদাবাদ তো এখানে নয়, বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে। 'মহাদুম,' গ্রহবাজ পায়রার বংশ, ও ঠিক পারবে।

মিয়া সাহেব পায়রাটিকে দেখতে লাগলেন।

মোল্লা সাহেব মনোমত একটি খাঁচা এনে কবুতরটাকে তার ভেতর পুরে দিয়ে বললেন, খাঁচাটা যেন গামছা কিংবা কাপড় চোপড়ে ঢাকা না পড়ে। পথের গাছপালা বাড়ীঘর চিনে রাখতে পাখিটার যেন কোন অসুবিধে না হয়।

খাঁচা হাতে নিয়ে মিয়া সাহেব বললেন, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি আপনার খদ্দের, আমার এসব জানা আছে।

মোল্লাসাহেব বললেন, এখন ঝট্‌কা হাওয়ার সময়। হঠাৎ সর্দি লেগে যেতে পারে। দয়া করে একটা রসুন সঙ্গে রাখবেন। তেমন বুঝলে কবুতরটাকে খাইয়ে দেবেন।

একটু থেমে বললেন, একটা তুক শিখিয়ে দি। মুর্শিদাবাদ থেকে যে সময় পায়রাটাকে ছাড়বেন, তার চার পাঁচ ঘড়ি আগে থেকে খাঁচাটাকে অন্ধকার করে ঢেকে রাখবেন। পায়রাটাকে একটুও কিছু খেতে দেবেন না। এরপর আকাশে ছেড়ে দিলেই ক্ষুধার্ত পাখিটা দ্রুত পাখা টেনে অনেক ওপরে উঠে যাবে। তারপর খিধের জ্বালায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উড়ে আসবে তার নিজের জায়গায়।

মিয়া সাহেব বললেন, তাই হবে।

বলেই একটি তন্‌খা ধরিয়ে দিলেন মোল্লাসাহেবের হাতে।

কবুতর নিয়ে এবার চলে গেলেন গণ্যমান্য অতিথি।

এমনি সব প্রয়োজনে লোকে আসে মেহেরুল্লাহ সাহেবের কাছে। দূরত্ব যত বাড়ে তন্‌খাও বেড়ে যায় সেই পরিমাণে।

রেশমী মেহেরুল্লাহ সাহেবের কাছে থেকে অল্প সময়ের ভেতরেই শিখে নিল পায়রা চালনার কৌশল।

॥ তিন ॥

সেনাপতি ইসলাম খান একা বসেছিলেন প্রাসাদের নীচে পরামর্শ-গৃহে। তিনি ছিলেন ঢাকা বিভাগে। সুলতান শুজার জরুরী দূত তাঁকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে রাজমহলে। তিনি দূতের মুখে শুনেছেন হারেম ও হারেমবাসিনীদের ভস্মীভূত হবার কাহিনী। মনের ভেতর গভীর একটা বেদনা গুমরে গুমরে উঠছিল তাঁর। দগ্ধ হয়ে গেছে পঁচাত্তর জন হারেমবাসিনী। হায়! তাঁর সেই বিশেষ পরিচিত আনন্দময়ী কন্যাটি যে অপঘাতে মৃত্যু বরণ করবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

সুলতান শুজা প্রাসাদের দ্বিতল থেকে নেমে এসে ঢুকলেন পরামর্শ-গৃহে।

ইসলাম খান উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন শাহজাদাকে।

শুজার প্রথম বাক্যটি হাহাকারের মত শোনাল, খানসাহেব, সারা ভারত ঢুঁড়ে যে সব দুর্লভ রত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা ভাগ্য বিপর্যয়ে হারিয়ে গেল।

ইসলাম খান প্রবোধ দিয়ে বললেন, আপনি উতলা হবেন না সুলতান শুজা। অন্ধকার চিরদিনের নয়। আপনার হারেমে আবার আলোর জোয়ার আসবে।

কিন্তু আমি আমার শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনীটিকে পাব কোথায়? সে-ই তো আমার হারেমের প্রধান আনন্দের উৎস। সমস্ত উৎসবের মূল পরিকল্পনাগুলি যে তার।

ইসলাম খানের হৃদয় সেই কন্যাটির জন্য খান খান হয়ে ভেঙে পড়লেও তিনি শুজার কাছে প্রকাশ করলেন না তাঁর গভীর অন্তর্বেদনার কথা। তিনি শুধু বললেন, যে যায় সে তো আর ফিরে আসে না জাঁহাপনা। তবে খোদার মর্জি হলে সবই সম্ভব।

শুজা উত্তেজিত হলেন, আপনি যথার্থ একটি কথা বলেছেন খানসাহেব, আল্লার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে।

খানিক সময় নীরব থেকে বললেন, আমার আজও বিশ্বাস রেশমীর মৃত্যু হয়নি।

আপনার এ অনুমানের কোন ভিত্তি আছে কি? আমি যতদূর শুনেছি, আপনার হারেমবাসিনীরা দগ্ধ হয়ে গেছে।

আপনি মিথ্যা শোনেননি খানসাহেব, তবে আমার অনুমানের একটি ক্ষীণ সূত্র আছে।

ইসলাম খান কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শাহজাদার দিকে।

প্রায় প্রতিটি দেহ ছাই হয়ে গিয়েছিল। তাদের বেশ কিছু অলংকার উদ্ধারকারীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে সংগ্রহ করতে পেরেছে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও একটি জিনিস পাওয়া যায়নি। বড় মূল্যবান সে বস্তুটি। আমি কাঞ্চনী রেশমীকে ওদিন নাচের শেষে উপহার হিসেবে দিয়েছিলাম।

কি সে বস্তু জাঁহাপনা?

একটি মুক্তার মালা।

ইসলাম খান বললেন, তীব্র দহনে মুক্তামালাটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়াই সম্ভব।

কিন্তু খানসাহেব, ঐ মালাটির মাঝে ছিল মূল্যবান একখণ্ড হীরে। সেটি তো ভস্ম হয়ে যাবার কথা নয়। সূক্ষ্ম চালুনিতে সব ভস্ম বার বার চেলেও ওটির হদিশ পাওয়া যায়নি। গোলকুণ্ডা থেকে আনা বড় আকারের দামী হীরে ছিল ওটি।

ইসলাম খান বললেন, যদি ঐ কাঞ্চনী বেঁচেই থাকে তাহলে তার ফিরে আসতে বাধাটা কোথায়?

সেটাই আমার কাছে রহস্যময় হয়ে আছে খানসাহেব। তবে ওর অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে যাবার ব্যাপারটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

খানসাহেব চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বসে রইলেন।

শুজা বললেন, আজ আপনাকে এখানে ডেকে আনার প্রধান কারণ, আপনি রেশমীর খোঁজে উপযুক্ত লোক পাঠান চতুর্দিকে। দেহান্ত না হলে ওকে ফিরিয়ে আনুন যে কোন উপায়ে।

আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব শাহজাদা, তবে জানিনা নসীবে কি আছে।

সুলতান শুজাকে কুর্নিশ করে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন ইসলাম খান।

শাহজাদা পায়ে পায়ে বেরুলেন হারেম সংলগ্ন বাগানের দিকে। আকাশে জলভারাক্রান্ত দুখণ্ড মেঘ দুলে দুলে চলেছে। তিনি তাদের দিকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন। দূরে নীলাভ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মেঘেরা নাকি ঐ পাহাড়ের বুকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়। অনেক সময় ভালবাসার উত্তাপে গলে ঝরে যায়।

দুদিন পর পর বৃষ্টি হয়েছিল। কদম্ব বনের ভেতর থেকে ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। বুক ভরে শুজা আঘ্রাণ করলেন সেই সুবাস। এগিয়ে গেলেন গাছগুলোর দিকে। মনে হল, কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার হাত ভরা চুড়ির রিনঝিন, পায়ে মলের ঝুনঝুন আওয়াজ।

গাছের ফাঁকে সূর্যের সোনালী আলো ঝরে পড়ছিল। শুজার

চোখের সামনে সেই সোনা রঙটা রূপান্তরিত হয়ে গেল রূপোলী আভায়।

শুজার মনে হল, ভারী নরম জ্যোৎস্না ঝরা পথ মাড়িয়ে তাঁর রহস্যময়ী প্রিয়ার সঙ্গে তিনি চলেছেন কদম্ব বনের দিকে।

থমকে দাঁড়ালেন তিনি। চারদিকে কদম্বের গাছ। দুটি বড় বড় সবুজ পাতার ফাঁকে একটি করে গোলাকার ফুল। হলুদ গুটিকার ওপর অসংখ্য সাদা কেশরের রোমাঞ্চ।

কে যেন বলল, আমাকে একটা ফুল পেড়ে দেবে ?

শুজা বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু ফুলের নাগাল পেলেন না। তিনি নিরাশ হয়ে দুঃখ করতে লাগলেন।

পার্শ্বচারিণী বলল, দুঃখ কর না, যে মুহূর্তে তুমি আমার জন্য চেষ্টা করেছ, সে মুহূর্তেই আমার পাওয়া হয়ে গেছে।

খট্ খট্ খট্ খট্ একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। শব্দটা এগিয়ে আসতে আসতে মৃদু হয়ে গেল।

শুজা তাকিয়ে দেখলেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘোড়ার সহিস তাবারক আলি।

সুলতান শুজা মুখ ফিরাতেই তাবারক আলি সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

শুজা দেখলেন, তাঁর প্রিয় ঘোড়া তাজি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ভোরবেলা শাহজাদা এই তাজির ওপর চেপেই গঙ্গা তীর ধরে এগিয়ে নগর পরিক্রমা করে আসেন। আজ তার ব্যতিক্রম হয়েছে, এটা তাজির নজর এড়ায়নি।

সুলতান শুজা তাঁর সুসজ্জিত প্রিয় ঘোড়াটির পিঠ চাপড়ে আদর করলেন। প্রত্যুত্তরে তাজি হ্রেষাধ্বনি করে তার কৃতজ্ঞতা জানাল।

শুজা ঘোড়ার ওপর উঠে বসলেন। গঙ্গার তীর বরাবর ঘোড়া ছোটাতে লাগলেন। বেলা বেড়ে গিয়েছিল তাই আজ আর নগর পরিক্রমায় না গিয়ে সোজা ফিরে এলেন প্রাসাদে।

প্রায় পক্ষকাল উদভ্রান্ত হয়ে আছেন শুজা। দগ্ধ হারেমের স্মৃতি কোনভাবেই মুছে যাচ্ছে না তাঁর মন থেকে।

ঢাকা থেকে রাজমহলে সরে এসেছে শুজার রাজধানী। কিন্তু

কি লাভ হল তাঁর? শুধু এতবড় একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হল তাঁকে।

অবশ্য দুর্ঘটনার জন্য কাকেই বা তিনি দায়ী করবেন। সবই ভাগ্য। তাকে এড়িয়ে চলার ক্ষমতা কারুরই নেই।

এই মুহূর্তে তাঁর হঠাৎ মনে হল, রাজমহল তাঁকে শান্তি দিতে পারবে না। স্মৃতির অদৃশ্যে কীট কুরে কুরে খাবে তাঁর বুকখানা। অতএব হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি লেখার সাজসরঞ্জাম আনিয়ে দিল্লীতে পিতার কাছে চিঠি লিখতে বসলেন।

মহামান্য সম্রাট, আপনার বহু কৃপাদৃষ্টি লাভ করেও অশান্তিতে ভরে আছে আমার অন্তর।

শরীর ভেঙে পড়ছে দিনে দিনে বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ুর ছোঁয়ায়। বিহার সংলগ্ন রাজমহলের আবহাওয়াও আমার শরীরকে শান্তি দিতে পারছে না। আমার সন্তানদের স্বাস্থ্য একেবারেই ভাল যাচ্ছে না।

আপনাকে এই প্রসঙ্গে জানাই, আমি বঙ্গদেশে আসার আগে যে সব দেশীয় দুর্বিনীত রাজন্যবর্গ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত, তারা এখন আমার কাছে নানারূপ উপ-ঢৌকন প্রেরণ করছে। আপনি নিঃসন্দেহে একে সাম্রাজ্যের পক্ষে শুভলক্ষণ বলে মনে করবেন।

আমি আপনার আজ্ঞাধীন। বঙ্গদেশ শাসনের অভিপ্রায় আমার নেই, এ ধরনের ধারণা যেন আপনার না জন্মে।

আমার প্রতি যে কর্তব্য মহামান্য সম্রাট নির্দেশ করেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

কেবল প্রার্থনা, বিহারের অন্তর্গত পাটনার কয়েকখানি গ্রাম আমার জন্য নির্দিষ্ট করা হোক। আমি সেখানে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমার সন্তানসন্ততিদের প্রেরণ করব। নিজে বঙ্গদেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে অক্ষুণ্ণ রাখব আপনার বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদা।

আপনার একান্ত বশংবদ
সুলতান শুজা

সম্রাট শাজাহান পূর্বে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, বঙ্গদেশের

সঙ্গে ওড়িষ্যার শাসনভারও তোমার ওপর ন্যস্ত করা হল। তুমি রাজমহলে থাকতে ভালবাস বলে একসময় জানিয়েছিলে। এখন তুমি তোমার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়বে। দেশ দেখতে দেখতে, মানুষজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে করতে তুমি এগোবে। পথে বনজংগলের অভাব নেই। শিকার করতে তুমি ভালবাস, সে সুযোগ পথেই তুমি পেয়ে যাবে।

এখন তোমার যাত্রাপথের একটা পরিচিত দিয়ে দিচ্ছি।

তুমি রাজমহল থেকে বর্ধমান হয়ে মেদিনীপুরে পৌঁছবে। মেদিনীপুর হল ওড়িষ্যার সীমান্ত জিলা। ওখানে বসেই তুমি ডাক পাঠাবে ওড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান কর্মচারীদের। হিসেব নিকেশ পর্ব শেষ হলে তুমি মেদিনীপুর থেকে চলে যাবে জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ)। ওখান থেকে সাতগাঁও-হুগলী হয়ে ফিরে আসবে তোমার রাজধানী রাজমহলে।

বিহারের কটি গ্রাম প্রার্থনা করে শুজা যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্রাট তার কোন জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বারে বারে রাজমহল সম্বন্ধে শুজার মতি পরিবর্তনকে তিনি ধরে নিলেন অস্থিরতার লক্ষণ বলে। রাজকুমারদের দোলাচল মতি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পক্ষে বিঘ্নকারী।

চারটি সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শাজাহান ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যগুলি শাসনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে কিন্তু দারা থাকতেন পিতার একেবারে নিকটে, রাজধানীতে। সম্রাটের শরীর শক্তিহীন হয়ে পড়ছিল দিনে দিনে। তাই দারার সকল আচার আচরণ মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও তিনি তাকে বরদাস্ত করে যেতেন। এমনকি সম্রাটের সিংহাসনের পাশে আর একটি স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট আসনও তৈরী হল। সেখানে বসতে লাগলেন দারা। সম্রাটের মোহর ব্যবহার করে ফরমানও জারি করতে লাগলেন তিনি।

শাজাহান লক্ষ্য করেছিলেন, ধর্মের ব্যাপারে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বড়ই উদার। খৃস্টানদের সঙ্গে যখন মেলামেশা করতেন তখন মনে হত, দারা বুঝি খৃস্টধর্মই গ্রহণ করল। আবার হিন্দুদের সঙ্গেও

মিশতেন সমান আগ্রহে। হিন্দু বৈদ্যরা তাঁর কাছে আনাগোনা করতেন। তিনি তাঁদের চিকিৎসার এমনই ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে বৈদ্যদের জমি জায়গা বিতরণ করতেন অকাতরে। হিন্দু দর্শনের ওপর তাঁর ছিল গভীর এক ধরনের আকর্ষণ। সুফি মতবাদকে তিনি মান্য করতেন।

এক সময় সম্রাটের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারার কথা হচ্ছিল। আগ্রার বাদশাহী মহলের বিশ্রাম কক্ষে বসেছিলেন পিতাপুত্রীতে।

বাদশা বললেন, তোমার ভায়েদের গুণ নয়, দোষ সম্বন্ধে অল্প দু'চারটি কথায় তোমার বিশ্লেষণ জানতে চাই।

জাহানারা হেসে বললেন, চার জনই চার অবতার। মুরাদ মনে করে তার মত বীর ভূভারতে কেউ নেই। ফুৎকারে সে সবাইকে উড়িয়ে দিয়ে বাজীমাত করে নেবে। তার বেশীর ভাগ চিন্তাই পরিচালিত হয় সুরার শক্তিতে। তার চরিত্রে বিচক্ষণতা অথবা দূরদর্শিতার চিহ্নমাত্র নেই, শুধুই আস্ফালন।

সম্রাট তারিফের গলায় বললেন, সাবাস! এবার শুজাকে নিয়ে কিছু বল।

শুজা বড়ই বিলাসপ্রিয় আর উচ্ছৃংখল কিন্তু নিজের পাওনা-গণ্ডা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন। নিত্য অসন্তোষ তাকে তাড়া করে ফেরে।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন, এবার কোনজন তোমার বিশ্লেষণের পাত্র?

আপনিই বলুন।

বেশ, দারা সম্বন্ধেই এবার তোমার অভিমত দাও।

সর্বধর্মের প্রতি উদার মনোভাব অন্যায় নয়, তবে আচরণে কিংবা বাক্যে তার ক্রমাগত প্রকাশ ও প্রচার সমীচীন নয়। এতে কাউকেই সন্তুষ্ট করা যায় না। শেষে সকল ধর্মের মানুষেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। রাষ্ট্র প্রধান হতে গেলে কেবল উদারতা নয়, যে গুণটি সবার আগে প্রয়োজন তা হল, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত পথের সন্ধান। দারার ভেতর এই গুণের একান্ত অভাব। অন্যদিকে দারা নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করে। কারুর পরামর্শ নেবার প্রয়োজন বোধ করে না সে। আলোচনার

সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিপক্ষের আত্মসম্মানে আঘাত হেনে বসে। যদিও তার ক্রোধ স্বল্পকাল স্থায়ী তবুও আহত মানুষের ক্ষোভ সহজে মুছে যাবার নয়।

সম্রাট বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, আশ্চর্য বিশ্লেষণ তোমার! আমার দৃষ্টিতেও এমন অনেক কিছু ধরা পড়েনি যা তোমার বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। এবার শেষজন আওরঙ্গজেব।

জাহানারা বললেন, ভেতর বাহির যার বর্মে ঢাকা তাকে ভেদ করা যাবে কেমন করে।

হাসলেন সম্রাট। মুখে বললেন, কি রকম?

সিংহাসনের সামনে আভূমি কুর্নিশ করে ও যখন ধীরে ধীরে মাথা তোলে তখন জানবেন ও সম্রাটকে আদপেই অভিবাদন জানাচ্ছে না। এই মহামূল্য স্বর্ণ সিংহাসনে কবে নিজে বসতে পারবে তারই হিসেব কষছে। এতবড় অভিনেতা সারা সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় একটি খুঁজে পাবেন না সম্রাট। আপনি যখনই কোন মূল্যবান অঞ্চল অথবা দুর্গাদি ওর সুবার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়ে ওমরাহদের সামনে ঘোষণা করেছেন, তখনই ও কৃতজ্ঞতা অথবা আনন্দ প্রকাশ না করে বলেছে, এর চেয়ে সম্রাট আমাকে মক্কা যাত্রার অনুমতি দিলে বেশী তৃপ্তি পেতাম। তবে আল্লা যখন সম্রাটের মুখ দিয়ে আমার ওপর ভার অর্পণের কথা ঘোষণা করেছেন, তখন তা গ্রহণ করা আমার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি।

সম্রাট শাজাহান উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, তুমি আমার পুত্র হয়ে জন্মালে না কেন জাহানারা! সমস্ত সাম্রাজ্যখানা তোমার হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দিয়ে আমি পরম শান্তিতে চোখ বুজতে পারতাম।

শুজা নিশাবসানে একটি স্বপ্ন দেখলেন।

লালকেল্লার প্রাসাদে শুরু হয়ে গেছে ভোরের সানাই-বাদন। ইতিমধ্যে কয়েক শত হস্তী স্নানপর্ব সমাপ্ত করে বহুমূল্য পরিচ্ছদ আর চিত্রলেখায় সুশোভিত হয়ে প্রবেশ-পথের দুইদিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অগণিত জনতা মিছিল করে আসছে গ্রাম গ্রামান্ত থেকে। তাদের মুখে শোনা যাচ্ছে নতুন সম্রাটের জয়ধ্বনি।

এত কোলাহলের মাঝে স্পষ্ট করে শোনা যাচ্ছে না সম্রাটের নামটা।

অশ্বারোহীরা অভিষেক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে তীক্ষ্ণধার বল্লম উঁচিয়ে উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে পুত্তলিকাবৎ।

হস্তী এবং অশ্বের সাজ বিশেষভাবে দর্শনীয়। অশ্বের জিনের ওপরে স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্রের কাজ করা মখমলি আসন। মাথায় রুপোর মুকুটের ওপর রঙীন পালক গোঁজা।

হস্তীর সাজ আরও দর্শনীয়। পিঠে সোনার কাজ করা আসন। হাওদার চারটি স্তম্ভই সুবর্ণ নির্মিত। তার ওপরে চীনাংশুকের চন্দ্রাতপ। চারদিকে দোল খাচ্ছে মূল্যবান মুক্তামালা। কণ্ঠে দুলছে স্বর্ণ নির্মিত ঘণ্টা। রুপোর সুচারু শৃঙ্খলে বেষ্টিত তার দেহ।

এদিকে দেওয়ানী আম গমগম করছে। মাথাব ওপব গুম্বজবাটের গুলবাহার বেশমী চন্দ্রাতপ। তাব প্রান্তগুলি স্বর্ণ স্তম্ভ পর্যন্ত টেনে রাখা হয়েছে রজ্জুর পরিবর্তে মণিমুক্তা গ্রথিত মালা দিয়ে। পারস্য থেকে উপহার পাওয়া গালিচাগুলি পাতা হয়েছে নীচে। চল্লিশটি স্তম্ভ সুসজ্জিত হয়েছে স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ করা কিংখাবে। চতুর্দিকে দুলছে সুবর্ণ শৃঙ্খল। তার থেকে প্রলম্বিত হয়ে আছে হীরক খচিত সুবর্ণগোলক।

দেওয়ানী আমের মাঝখানে সোনার পা-ওয়ালা বিশ্বের বিস্ময় ময়ূর সিংহাসন।

আমীর ওমরাহরা ঘিরে বসে আছেন চতুর্দিকে। সুসজ্জিত বাদ্যকারেরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অপেক্ষমান। নতুন সম্রাট আসবেন, তাঁরই প্রতীক্ষায় সবাই নির্বাক।

শুজা দেখলেন, তার দেহে পারস্য থেকে আনা সোনার কাজ করা অতি মহার্ঘ্য রক্তবর্ণের পোশাক। মাথায় হীরকখচিত শিরস্ত্রাণের চতুর্দিকে দুলছে মুক্তোর মালা।

সুলতান শুজা ডাকতে লাগলেন, রেশমী, রেশমী!

ঘণ্টা বাজছে। জ্যোতিষী ঘোষণা করছেন সিংহাসনে আরোহণের লগ্ন।

সুলতান শুজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেশমী।

তুমি আজ আর সামান্য নর্তকী নও রেশমী, তুমি আমার পেয়ারের বেগম। তোমার কণ্ঠে আমার দেওয়া যে মুক্তোর মালাটি রয়েছে তা নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমার কণ্ঠে। তোমার ঐ বিজয় মাল্যটি নিয়েই আজ হোক আমার সিংহাসন আরোহণের প্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

মালা পরার জন্য মাথাটি ঈষৎ নত করলেন সুলতান শুজা।

হাহাকার করে সহসা কে যেন কেঁদে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল শুজার। ঘর্মাক্ত দেহে উঠে বসে তাকাতে লাগলেন চতুর্দিকে। কেউ কোথাও নেই। বাতায়ন পথে চোখ গিয়ে পড়ল ভগ্ন দগ্ধ হারেমের ওপর। জ্বলছে। পূবের আকাশ জুড়ে জ্বলছে লাল আগুনের শিখা।
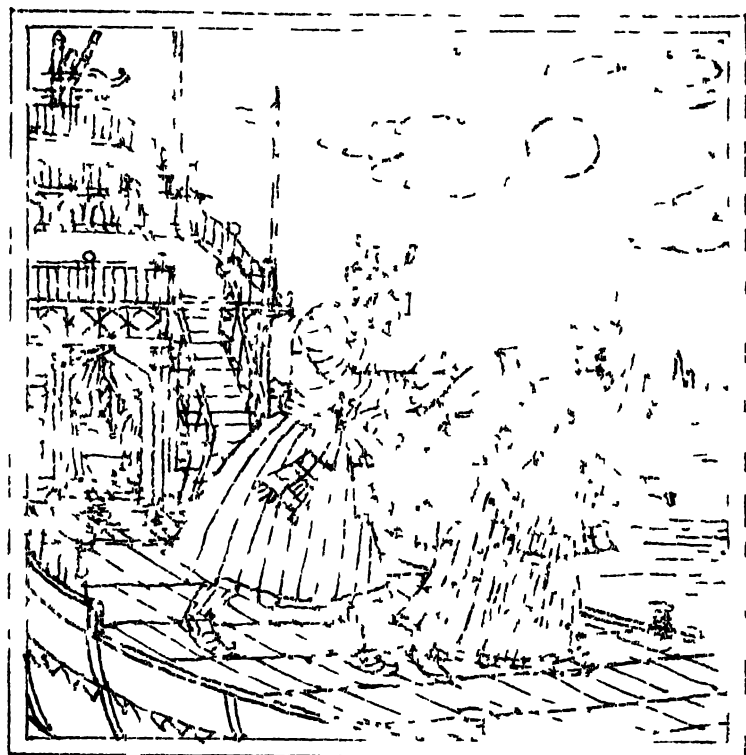
॥ চার ॥

আশ্চর্য একটি ঘূর্ণির ভেতর কেটেছিল রেশমীর জীবন। অবিশ্বাস্য আবর্তে ভরা। চিকিৎসক সাইমন ফার্নাণ্ডেজ আর দেবদাসী মীনাক্ষির ভালবাসার সন্তান সে। পর্তুগীজদের সব থেকে বড় ব্যবসাকেন্দ্র ক্রীতদাস-পল্লীতে এসে একদিন উঠেছিলেন রেশমীর বাবা আর মা। ফিরিঙ্গি দস্যুরা সপরিবারে থাকত চট্টগ্রাম বন্দরের একদিকে। বিলাসবহুল তাদের জীবনযাত্রা। প্রায় পাঁচ হাজার পর্তুগীজ ঘর বেঁধে থাকত সেখানে। একটু দূরে সারি সারি চালাঘর। তাকে ঘর আখ্যা দিলে ঘরের মর্যাদা হানি হয়। বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের ছাউনি। চারদিক খাঁ খাঁ করছে, চিহ্নমাত্র নেই দেয়ালের। এগুলি দশ, পনের হাজার হতভাগ্য ক্রীতদাসদাসীর সাময়িক আস্তানা।

গ্রাম গঞ্জে, মেলা মহোৎসবে, বরযাত্রা থেকে বিবাহ বাসরে সহসা ঝলসে উঠত শাণিত তরবারি।

হার্মাদ! হার্মাদ! আর্তনাদে কেঁপে উঠত বাতাস। তলোয়ারের খোঁচায় স্তব্ধ হয়ে যেত সমস্ত সাহস।

সেইসব হতভাগ্যদের জাহাজের খোলে বোঝাই করে নিয়ে আসা হত চট্টগ্রামের বন্দরে।

অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় ভরা সেইসব জলযাত্রা। বহু সমর্থ যুবককে কয়েকদিন ধরে গ্রামগঞ্জ ঢুঁড়ে তোলা হতো জাহাজে। অনেকসময় অনটন পড়ত খাবারে। তাছাড়া একসঙ্গে এতগুলো যুবক থাকলে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনা। এসব কথা মগজে রেখে নিষ্ঠুরতম পরিকল্পনার ছক তৈরি করেছিল ফিরিঙ্গি দস্যুরা।

জাহাজের খোলের ভেতর অন্ধকারে গাদাগাদি হয়ে পড়ে থাকতে হতো কয়েকদিন। পরে যখন তাদের ডাঙায় তোলা হতো তখন চোখ ধাঁধিয়ে যেত সূর্যের আলোয়। অনেকে ঐ অবস্থায় অচেনা পথে চলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত মাটিতে। পাশে দাঁড়ানো ফিরিঙ্গিগুলো তারই ওপর আঘাত করত নির্মমভাবে। যাতে সঞ্চিত সামান্যতম শক্তি ও সাহস একেবারে শরীর আর মন থেকে নির্মূল হয়ে যায়।

কিন্তু এ তো যাত্রা শেষের সামান্য দাওয়াই। যাত্রার শুরুতে হতভাগ্যদের বেঁধে ফেলা হতো নির্মম একটা বাঁধনে। তৈরি করা থাকত সরু আর লম্বা শত শত বেতের ছিলা। বাঁ হাতের তালু ফুটো করে সেই বেতের ছিলা ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। একটি লম্বা বেতের ছিলাতে বাঁধা পড়ত অন্তত দশটি হাত। এমনি করে আহত মানুষগুলো জ্বরে, যন্ত্রণায় ধুঁকতো আর কুঁকড়ে পড়ে থাকত আতঙ্কে।

ভারাক্রান্ত মন, দেহের যন্ত্রণা আর ফেলে আসা সংসারের ছবি তাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখত সারাক্ষণ। তারা ভুলে যেত ক্ষুধা আর নিদ্রার কথা। তবু প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রয়োজন এ দুটি বস্তুর। একই অন্ধকার খোলের ভেতর কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, কেউ জ্বরে ধুঁকত, কেউবা অচেতনের মতো ঘুমতো, আবার কেউ অনাগত ভাগ্যের কথা ভেবে ঘন ঘন ফেলত দীর্ঘশ্বাস।

সেই ঘামে, পূতি গন্ধে, হতাশ্বাসে ভরা জাহাজের অন্ধকার খোলের ভেতর তৈরি হতো একটা নরক। কখনো সখনো খোলের ওপরকার পাটাতনের গোলাকার ছিদ্র-মুখটা খুলে যেত। সেখান থেকে কেউ ছুঁড়ে দিত ডেলা ডেলা ভাত। সেগুলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ত মেঝেতে। ক্ষুধার্তরা তাই কুড়িয়ে চেঁচে পুঁছে খেত প্রাণ-রক্ষার তাগিদে। জলের জালা বসানোই থাকত জাহাজের খোলের এক কোণায়। অর্ধমৃত, আতঙ্কিত, ম্লানমুখ সেই মানুষেরা যখন নামত জাহাজ থেকে তখন তাদের দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত ফিরিঙ্গি পাড়ায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ফেটে পড়ত উল্লাসে।

এরপর কড়া পাহারার ভেতর তাদের রাখা হত হাট চালায়। এখানেই শুরু হত বাছাই পর্ব।

বিভিন্ন কাজে দক্ষ যুবক যুবতীদের বাছাই করে আলাদা রাখা হত। যুবতীদের ক্ষেত্রে যারা নাচ গান, সেলাইয়েব কাজ আব আচার মেঠাই তৈরী করতে জানত তাদের কদর ছিল বিদেশেব বাজারে সবচেয়ে বেশী। সুন্দর শ্যামলা রঙ, টলটলে মুখ আর টানা টানা চোখের আকর্ষণ বিদেশীদের কাছে ছিল দুর্নিবার।

দ্বিতীয় বাছাই পর্বে কর্মঠ নারীপুরুষদেরই বেছে নেওয়া হত। এখানে সুন্দর অসুন্দরের কোন বাছাই ছিল না। এরা সাধারণত দেশীয় দাসদাসীর বাজারে বিক্রি হত কিছু কম মূল্যে। গোয়ার পর্তুগীজরা ছিল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দাসদাসীদের সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

এইসব হতভাগ্য নারীপুরুষ যখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট বাজারটিতে গিয়ে দাঁড়াতো তখন তাদের সঙ্গে পশুদের কোন পার্থক্য থাকত না। নিলামদাররা ক্রেতা আকর্ষণের জন্য এদের অর্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখত।

ডাক্তার সাইমন ফার্নাণ্ডেজ কেবলমাত্র একজন প্রেমিক ছিলেন না, মানব দরদী মহাপ্রাণ এক সেবাব্রতী ছিলেন। রাত্রিদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অসুস্থ, আহত মানুষগুলোর সেবা করে

বেড়াতেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চেষ্টা করতেন সান্ত্বনা দেবার।

মহামারি দেখা দিলে সারারাত জেগে সেবা করতেন। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর কোমল স্বভাবা দেবদাসী স্ত্রী, মীনাক্ষি।

হার্মাদ সর্দার কখনো সখনো চলে আসতেন ডাক্তারের আস্তানায়। সেখানে ডাক্তার ফার্নাণ্ডেজ কিংবা তাঁর স্ত্রীর দেখা না পেয়ে রেশমীকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার বাবা কোথায় খুকি?

রেশমী ছোটবেলা থেকেই মানুষটাকে একটুও পছন্দ করত না। একটা কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হাতের চাবুক বাতাসে আছড়াতে আছড়াতে লোকটা জাহাজ ঘাটায় ছুটে বেড়াত। সারি সারি হতভাগ্য মানুষগুলো যখন জাহাজ থেকে নামত তখন সে চিৎকার করে, চাবুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে তাদের ভয় দেখাত। দূরে দাঁড়িয়ে ওর কীর্তিকলাপ দেখত রেশমী।

সর্দার ডিয়াগো ডি সুজার জিজ্ঞাসার উত্তর মুখে না দিয়ে রেশমী আঙুল তুলে দেখাত দাসদাসীদের ডেবাগুলোর দিকে।

সর্দার ডি সুজা দূর থেকে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসতেন।

ঘোড়া থেকে নেমে স্বদেশীয় ভাষায় হেঁকে বলতেন, এই জানোয়ারগুলোর খোঁয়াড়ে কি করছেন আপনি সারাদিন?

ডাক্তার ফার্নাণ্ডেজ হেসে বলতেন, এরাই তো আপনার কোষাগারের সেরা সব রত্ন সর্দার। এদের ঘষে মেজে না রাখলে জেল্লা বেরুবে কি করে! আর জেল্লা না থাকলে বিদেশের বাজারে বিকোবেই বা কি দামে?

সর্দার ডিয়াগো ডি সুজা ভাল করেই জানতেন, ডাক্তার আসার পর মহামারি, মড়কে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। তাতে ব্যবসায়ে লাভ হচ্ছে প্রচুর।

সর্দার বলতেন, পর্তুগীজ মহল্লায় মেয়ে পুরুষ সকলেই আপনার মুখ চেয়ে বসে থাকে ডাক্তার। কালেভদ্রে আপনার শুভাগমন হয় ওদিকে।

ডাক্তারের আবির্ভাব যে বাড়ীতে যত কম হয় ততই মঙ্গল নয় কি সর্দার ?

সাইমন ফার্নাণ্ডেজের মন্তব্য শুনে হাজার হাজার হতভাগ্য মানুষকে চমকে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠতেন সর্দার ডি সুজা।

চলে যাবার সময় বলতেন, আপনার বহু গুণবতী স্ত্রীটিকে নিয়ে একদিন আসবেন আমাদের মহল্লায়।

সেদিন রোগী দেখা হবে না কিন্তু সর্দার। কেবল নাচ গান আর খানাপিনা।

সর্দার বলতেন, বহুত আচ্ছা, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

ছোটবেলাটা কেটেছিল রেশমীর একটা স্বপ্নের জগতে। সে প্রতিদিন নিয়ম করে নাচ শিখত মায়ের কাছে। নাচ শেখার পাঠ শেষ হলে মা তাকে পরিয়ে দিতেন একটি রঙীন পোশাক। তারপর মা বাবা বেরিয়ে যেতেন চিকিৎসার কাজে। অমনি রেশমী ছুটে যেত কর্ণফুলী নদীর তীরে। এক ঝাঁক পাখি হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে ফিরত আকাশে। রেশমীও ওদের মত দুটো হাত শূন্যে ভাসিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নাচতে নাচতে ছুটে চলত।

বন্ধুরা এসে জুটত রেশমীর সঙ্গে। ছেঁড়া ময়লা এক এক ফালি কাপড় নেংটির মত করে পরা। এক মুঠো ভাত মায়ের ভাগ থেকে হয়তো পেত ওরা। মাকে গ্রাম গঞ্জের হাট থেকে ধরে নিয়ে আসবার সময় ওরাও চলে আসত সঙ্গে। জীর্ণ, শীর্ণ, খেতে পায় না তবু কি আনন্দে রেশমীর সঙ্গে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে বেড়াত ওরা। কিন্তু কয়েকটা দিন ওদের সঙ্গে খেলাধুলার পর রেশমী দেখত, ওরা কোথায় হারিয়ে গেছে। আবার এক ঝাঁক নতুন মুখের আমদানি। মায়েদের সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চাগুলোকেও পাঠিয়ে দেওয়া হত দাসদাসীর হাটে। সেখানে বাচ্চাগুলোর যা হয় হোক। ফিরিঙ্গি বাজারের আস্তানা তো খালি হল। এবার নতুন দল আসবে পুরানোর জায়গায়।

রেশমী ফিরিঙ্গি পাড়ার দিকে বড় একটা ঘেঁষত না। ওদের ছেলেমেয়েরা রেশমীদের ডেরায় এসে মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে যেত ওকে। ওদের মায়েরা বলতেন, তুমি একা একা কোথায় খেলা কর ?

রেশমী অবাক হয়ে উত্তর দিত, একা খেলব কেন! ওরা সবাই সমুদ্রের ধারে আমার সঙ্গে খেলা করে। আমরা নাচগান করি, হুটোপুটি খেলি।

আবার প্রশ্ন, ওরা কারা?

ঐ যারা হাটচালায় ঘর বেঁধে থাকে, তাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা।

ওঁরা রেশমীর কথা শুনে মুখ চাওয়াচাওই করতেন। বলতেন, সে কি! তোমার মা বাবা কিছু বলেন না?

কই না তো।

ওঁরা বলতেন, ওদের সঙ্গে মিশতে নেই, খেলতে নেই। ওরা নোংরা হতভাগা। তুমি রোজ এ পাড়ায় চলে আসবে।

রেশমী কিন্তু ওদের কথা শুনত না। প্রায় রোজ ঐ নোংরাদের সঙ্গেই খেলা করত।

চাটগাঁ ছিল আরাকান রাজার অধীনে। সেখানে যেসব ফিরিঙ্গি থাকত তাদের বেশীর ভাগই জলদস্যু। মগ রাজার দরকার পড়লে ফিরিঙ্গিরা গোলন্দাজের কাজ করে দিত। সেজন্য এদের রমরমা দাস ব্যবসায়ের কাজে কখনও বাধা দিত না আরাকানের শাসন-কর্তারা।

তখন আরাকানের অধিপতি সুধর্মরাজের ভাই মংগৎ রাই ছিলেন চাটগাঁয়ের শাসনকর্তা। তিনি প্রায়ই তাঁর রাজবাড়ীর অসুখ বিসুখে ডেকে পাঠাতেন রেশমীর বাবাকে। কখনো সখনো বাবার সঙ্গে রাজবাড়ীতে যেত রেশমী। মংগৎ রাইয়ের স্ত্রী খুব আদর করতেন হেকিম সাহেবের মেয়ে রেশমীকে। তাঁদের বাড়ীর একটি মেয়ে ছিল রেশমীর বয়সী। তাকে খুব ভাল লাগত রেশমীর। মাজা পেতলের মত তার গায়ের রঙ। চোখ দুটো চেরা, সরু সরু। গালচাপা, হনু উঁচু মুখখানা। সে রেশমীকে পেলে ছাড়তেই চাইত না। দু'একদিন ওদের বাড়ীতে থেকেও যেত রেশমী। এমনি কিছুদিন ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে ওদের ভাষায় মোটামুটি কথাবার্তা চালাতে শিখল সে। বান্ধবীটির নাম ছিল সারিকা।

মহাকালের নিরন্তর ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে বেশ বড় সড়ো আর

মনোহারিণী হয়ে উঠল রেশমী। একদিন হেকিম সাহেব বাড়ীতে নিয়ে এলেন একটি মেয়েকে। স্ত্রীর সঙ্গে কিছু পরামর্শ হল তাঁর। রেশমী জানল, মেয়েটি কাজকর্মে তার মাকে সাহায্য করবে।

গরীবের ছাপ থাকলে কি হয় মেয়েটি দেখতে ভারী সুশ্রী, গায়ের রঙটি শ্যামলা। রেশমীর চেয়েও ছিল দু'তিন বছরের বড়। মেয়েটি মুখ তুলে কারু সঙ্গে বড় একটা কথা বলত না। চুপচাপ কাজ করে যেত। সারা মুখখানাতে একটা করুণ ছবি ফুটে উঠত ওর। সেই ভাবখানা লক্ষ্য করে কেমন একটা চাপা দুঃখ গুমরে উঠত রেশমীর বুকের মধ্যে।

একদিন রেশমীর মা বাবা রোগী দেখার কাজে বেরিয়ে গেলে রেশমী তাদের নতুন আমদানী কুসুমকে নিয়ে চলে গেল সমুদ্রের ধারে।

তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই সে হঠাৎ তার দুটো বড় বড় চোখ মেলে তাকাল। ভয়ানক ভয় পেলে যেমন হয়, তেমনি ছবি ফুটে উঠল তার চোখে।

রেশমী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুকের ভেতর টেনে নিতেই আকাশ ভাঙা বৃষ্টিধারায় ভিজে গেল তার বুকখানা।

রেশমী বলল, ভয় কিসের, তুমি তো আমাদের কাছেই রয়েছ। এখুনি কেউ তোমাকে দাসী হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে না।

সে ফ্যাল ফ্যাল করে রেশমীর দিকে তাকিয়ে রইল। সম্ভবত 'দাসী হাটে বিক্রি' কথাটার অর্থ ও ধরতে পারেনি।

মনে হল মেয়েটা ভয়ে, উদ্বেগে একেবারে জীর্ণ হয়ে আছে। মায়ের মুখে শুনেছিল রেশমী, সদ্য ধরে আনা হয়েছে মেয়েটিকে। চাষাভুষোর বাড়ীর মেয়ে হলে কি হবে স্বাস্থ্যে আর মুখশ্রীতে ও বড় ঘরের মেয়েদেরও হার মানিয়ে দেবে। এমন সুন্দর একটি মেয়ে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে সেরা বাছাইয়ের দলে। কিন্তু হলে কি হয়, ধরে আনার পর থেকে ও জাহাজের খোলে ঘন ঘন মুর্চ্ছা গেছে। ডাঙায় উঠেও সেই একই অবস্থা। ফিরিঙ্গি সর্দার চিন্তিত। এত বড় একটা লাভের জিনিস জখম হলে ক্ষতির পরিমাণ কম হবে না। তাই ডাক পড়ল হেকিম সাহেবের। যে করেই হোক মেয়েটিকে সারিয়ে তুলতে হবে।

রেশমীর বাবা দেখলেন, মেয়েটি তার ভয় আর দুশ্চিন্তা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথমে জলদস্যুগুলো ঐ বেচারার ওপর নিজস্ব দাওয়াই প্রয়োগ করেছিল। ভয় দেখানো, অত্যাচার কিংবা বিয়ে করে নতুন সংসার পাতার প্রলোভন কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হয়নি। মেয়েটি একেবারেই মূক হয়ে গেল।

রেশমীর বাবা ওদের সর্দারকে বললেন, এখানে হট্টগোলের মাঝখানে রেখে ওকে সারিয়ে তোলা যাবে না। আমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে কিছুদিন থাক। চেষ্টা করে দেখব যদি মেয়েটাকে সুস্থ করে তোলা যায়। না হয় আমাকেই বেচে দেবেন কিছু অল্প মূল্যে, আমার মেয়েটার সঙ্গী হবে।

সেদিন সমুদ্রের ধারে বসে কুসুমের মুখ থেকে টুকরো টুকরো কিছু কথা শুনেছিল রেশমী। সুখের নীড় দমকা ঝড়ে উড়ে যাবার করুণ কাহিনী।

ওর বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক। ঘরে দু'বছর বয়সের একটি ছেলে ছিল ওর। বর কাজ করত একটা মাছ ধরার নৌকোয়। বেশ শক্ত সমর্থ যুবক। সারাক্ষণ থাকত হাসি, গান আর খোশ মেজাজে। এই তিনজনকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল তাদের ছোট একটা সুখী সংসার। নদীর ধারে জংলা গাছের জটলার ভেতর পাখপাখালি আর কাঠবেড়ালীর আড্ডায় ওরা একটা কুড়ে ঘর বেঁধেছিল। দু'বছর বয়সেই বেশ লায়েক হয়ে উঠেছিল ছেলেটা। হাততালি দিয়ে পাখিদের ওড়াতো, খাবার ছড়িয়ে কাঠবেড়ালীকে ডাকত 'আয় আয়' বলে।

কত সুখের স্মৃতিতে বুক ভরেছিল কুসুমের। ছেলেকে বুকে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে ঘুরেছিল রথের মেলায়। কদমা আর খাজা কাঁঠাল কিনে খেয়েছিল। চলন্ত রথের রশিতে হাত ঠেকিয়ে সেই হাত ছুঁইয়ে দিয়েছিল ছেলের কপালে। মেলার শেষে বৃষ্টি নেমে ছিল। বরের হাত ধরে জল কাদা ভাঙতে ভাঙতে ও হেঁটেছিল খেয়াঘাটের দিকে ফিরতি নৌকো ধরবে বলে।

সে সব স্মৃতি ভুলতে পারেনি কুসুম।

আর একবারের কথা বলেছিল সে। বর তাকে বলে গেল,

নৌকো যাবে বাহার গাঙে মাছ ধরতে, তাই ঘরে ফিরতে রাত হয়ে যাবে তার।

ভাত রেঁধে সারারাত হাঁড়ি আগলে বসে রইল কুসুম, দেখা নেই মানুষটার। নদীর ধারে গিয়ে ভোরবেলা বুক ফাটিয়ে কাঁদল। হারাধনের বাপ কোথায় গেলে গো, বলে ভাঙা গলায় কত ডাকল, মানত করল মা গঙ্গার কাছে কিন্তু সেদিনও ফিরে এল না কুসুমের বর গুণধর।

এলো তিনদিন বাদে ঝড়ো কাকের মত। স্রোতের টানে নাকি ওদের নৌকোটা ভেসে গিয়েছিল দিশাহীন সমুদ্রে।

ববকে সেদিন জড়িয়ে ধরে কুসুম যত কাঁদল, তত কীলচড় মারল তার বুকে। শেষে চোখের জলে ক্ষোভ, আক্ষেপ আর দুশ্চিন্তার আগুন নিভে গেলে ও স্বামীকে নিয়ে পড়ল। নিজের হাতে তেল মাখিয়ে গামছা দিয়ে রগড়ে গা ধুইয়ে দিল। যেন তার সন্তান হারাধনের সঙ্গে এ মানুষটার কোন তফাৎ নেই।

এরপর খেতে বসে গুণধর কথায় কথায় জানতে পারল, তিনদিন কুসুম মুখে অন্নজল তোলেনি।

গুণধর কুসুমকে ধরে সেদিন নিজের হাতে ভাত মেখে খাইয়ে দিয়েছিল।

যেদিন ফিরিঙ্গিদের হাতে ধরা পড়ল কুসুম সেদিন গুণধরের শরীরটা জুত ছিল না বলে কাজে বেরোয়নি। ছেলেটাকে সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে কুসুমকে একাই পাঠিয়েছিল গঞ্জের হাটে।

সেখানেই ভাগ্যের খেলায় সব ওলট পালট হয়ে গেল তার জীবনে।

গল্পের নরখাদকগুলো যেন হা হা আওয়াজ তুলে ঝকঝকে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ঘিরে ফেলল গঞ্জের বাজার। মুহূর্তে আতংকের একটা আকস্মিক ঝড়ে হত বুদ্ধি হয়ে গেল মানুষ গুলো। তারা ঘূর্ণির মুখে শুকনো পাতার মত উড়তে লাগল এদিক ওদিক। শেষে তলোয়ারের মুখে ওদের জড়ো করা হল একঠাঁই। আতংকে তখন ওরা আধমরা পশুর মত ধুঁকছে।

বুড়োদের বাদ দিয়ে বাছাই করে নেওয়া হল তরতাজা জোয়ান-দের। কিছু বাচ্চাকাচ্চা জড়িয়ে ধরে রইল মায়ের বুক আর

গলা। বাতাসে চাবুকের সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে কুসুমদের ঠেলে ফেলে দেওয়া হল জাহাজের খোলে।

রেশমীর বাবা দেখলেন, আতংকের শিকার হয়ে গেছে কুসুম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। দরজা খুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলে সমুদ্রের দিকে। ছেলের নাম ধরে আকুল হয়ে ডাকে। সাড়া না পেয়ে মাথা কুটে কাঁদে।

কখনো রেশমীর বাবা, কখনো মা তাকে আদর করে হাত ধরে ঘরে ফিরিয়ে আনতেন।

এক সময় ডাক্তার ফার্নাণ্ডেজ ভাবলেন, যদি কিছু ছেলেমেয়ে কুসুমের কাছে এনে দেওয়া যায় তাহলে ও হয়তো ওর দুঃখটা অনেকখানি ভুলে থাকতে পারে।

তিনি সেই দিনই চলে গেলেন ফিরিঙ্গি সর্দারের কাছে। একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা পেশ করলেন দলপতির এজলাসে।

পরিকল্পনাটি শুনে সর্দার হকিম সাহেবকে বাহবা দিয়ে বলে উঠলেন, ফার্নাণ্ডেজ সাহেব, আপনি কেবল একজন ভাল চিকিৎসকই নন, আপনার মগজটা অনেক দামী জিনিসে ভরা।

একটা ঘটনার ওপর তৈরী হয়েছিল সাইমন ফার্নাণ্ডেজের পরিকল্পনা। যে সব মেয়েদের হার্মাদরা ধরে নিয়ে আসত তাদের অনেকের সঙ্গেই চলে আসত বাচ্চাকাচ্চাগুলো। যখন মায়েদের দাসদাসীর হাটে বিক্রি করে দিত তখন ছেলেমেয়েগুলো খড়কুটোর মত উড়ে বেড়াত হাটের এদিক ওদিক। নির্মম ক্রেতা মায়ের সঙ্গে তার সন্তানের দায়িত্ব নিত না। মা ছেলেকে ছেড়ে যাবার সময় পেছন ফি'রে উচ্চৈস্বরে কাঁদত। ক্রেতা টানতে টানতে নিয়ে যেত তার ক্রীতদাসীকে। ছেলেটা অনেক দূর অবধি মায়ের পেছনে ছুটে ছুটে, শেষটা হাল্লাক হয়ে গড়িয়ে পড়ত পথের ওপর। অধিকাংশ সময় আশ্রয় জুটত না। মারা পড়ত না খেতে পেয়ে।

ফার্নাণ্ডেজ সর্দারকে বললেন, আপনি এই অভাগা ছেলেগুলোর জন্য কিছুটা জমি দিন। তার ওপর তুলে দিন টানা লম্বা একটা খড়ের ঘর। কিছুদিন ওদের খাইয়ে পরিয়ে রাখুন। কিছুটা বড় হলে ওরা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী করে নেবে।

সর্দার হেসে বললেন, এতসব খরচ করে আমার লাভ ?

হেকিম সাহেব বললেন, লাভ আছে। ওদের যদি আপনি বাঁচার সুযোগ করে দেন তাহলে ভবিষ্যতে ওদেরও দাসদাসীর হাটে বেচে দিয়ে এককালীন অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবেন।

হেকিম সাহেবের এই কথা শুনে সর্দার খুব তারিফ করলেন। তিনি বললেন, আমি থাকার ডেরা তৈরী করে দেব, খাবার ব্যবস্থাও করে দেব কিন্তু ঐসব বাচ্চাদেব সামলাবে কে ?

সাইমন বললেন, সে ব্যবস্থার ভার রইল আমার ওপর। যে মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য আপনারা আমার কাছে রেখেছেন তাকে দয়া করে মুক্তি দিন। আমার স্ত্রী তাকে নিয়ে ঐ শিশুদেব আস্তানার তদারকি করবে। আপনি চাইলে মেয়েটির জন্য কিছু মূল্যও দিতে পারি।

সর্দার হা হা করে হেসে উঠে বললেন, আমি কারবারি ঠিক, তাবলে উপকারী মানুষের কাছ থেকে দাম নেব এমন মানুষ নই।

সাইমন ফার্নাণ্ডেজ শুরু করে দিলেন কাজ, গড়ে উঠল শিশু ভবনটি। রেশমীর মা আর কুসুম ঝাঁপিয়ে পড়ল হতভাগ্য ছেলে-গুলোব সেবার কাজে। কিছুদিন পরে দেখা গেল কুসুম অনেক-খানি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে আর রাতে ছেলেকে স্বপ্নে দেখে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায় না। নিজের ছেলের কথা মনে পডলে তারই সমবয়সী কোন একটি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কিছুক্ষণ কান্নার পর আপনিই শান্ত হয়ে যায়।

এরপর রেশমীর মা আর বাবাকে রেশমীর মতই বাবা, মা বলে ডাকতে লাগল কুসুম।

এতবড একটা আশ্রয়, এমন মনের মত একটা কাজ পেয়ে সে যেন বর্তে গেল।

রেশমীর বয়স তখন পনের, ষোল। এমনিতে তার দেহের গড়ন চিরদিনই বাড়বাড়ন্ত। তাই যখন তখন একা একা যেখানে সেখানে

আগের মত ঘুরে বেড়াত না। মায়ের সঙ্গে শিশু-ভবনটিতে যেত মাঝে মাঝে। সেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে কিছু সময় হুটোপুটি করে বেশ আনন্দে মজে থাকত সে।

ছেলেবেলা থেকে নাচেগানে তালিম নিয়েছিল মায়ের কাছে সকাল সন্ধ্যায়।

ষোল বছর বয়সেও রেহাই পায়নি সে নিয়মের হাত থেকে। রেশমীর মা যে কত বড় গুণী শিল্পী তা কাউকে মুখে বলে বোঝানো যাবে না। তাঁর নাচ যে না দেখেছে সে শুধু অনুমান করে কিছু বুঝতে পারবে না।

এখন আমরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তার প্রাসাদের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরাব। আগেই আমরা জেনেছি, আরাকান রাজের ভাই মংগৎ রাই ছিলেন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। চিকিৎসার সুবাদে তাঁর বাড়ীতে সাইমন ফার্নাণ্ডেজের বেশ খ্যাতির ছিল। মংগৎ রাইয়ের ছোট মেয়েটি ছিল রেশমীব বয়সী। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল আরাকানের কোন এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

রেশমী ওদের বাড়ীতে গেলে দু'তিন দিন মংগৎ রাইয়ের ছোট মেয়েটি তাকে আটকে রেখে দিত। গল্প করত প্রাণ খুলে। ও রেশমীকে মাঝে মাঝে দামী কিছু কিছু উপহারও দিত।

ওদের বাড়ীতে সেদিন বান্ধবীর অনুরোধে থেকে গিয়েছিল রেশমী। বান্ধবী এক ফাঁকে বলল, আজ সন্ধ্যায় আরাকান থেকে আমার দাদা এসে পেঁছিবে।

রেশমী বলল, তোমরা তো দু'বোন, দাদা এল কোথা থেকে?

বান্ধবীটি হেসে বলল, আরাকানের মহারাজ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র, আমার দাদা।

রেশমী বুঝতে পারল, বান্ধবী তার পিতৃব্য পুত্রের কথা বলছে।

ও আরও বলল, এই দাদাই আরাকানের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। আসছে, চট্টগ্রাম ঘুরে দেখতে।

কৌতূহলী হয়ে উঠল রেশমী, কিসে আসছেন তিনি?

বান্ধবী বলল, জাহাজে। সন্ধ্যার আগেই বন্দরে জাহাজ এসে ভেড়ার কথা। বাবা আগেই বেরিয়ে গেছেন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে সঙ্গে

করে আনতে। তবে আমার দাদার অনুরোধে তার আসার ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। তাই তোপধ্বনি কিংবা তোরণ সাজানোর কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি।

কথাটা শুনে রেশমীর কেমন যেন সংকোচ বোধ হচ্ছিল। সে এ ব্যাপারটা আগে জানতে পারলে রাজবাড়ীতে কিছুতেই থাকত না। নিতান্ত বন্ধুর অনুরোধে থাকবে বলে কথা দিয়েছিল। বাবাও রেশমীকে বলে গিয়েছিলেন নিশ্চিন্তে থাকতে। চার পাঁচ দিন পরে এসে তিনি তাকে ঘরে নিয়ে যাবেন।

মহারাজ সুধর্ম রাজের ছেলে বসুধর্মা খুল্লতাতের সঙ্গে সুসজ্জিত হাতির পিঠে চেপে এলেন প্রাসাদে। রেশমী তার বান্ধবীর সঙ্গে অন্তঃপুরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখছিল আরাকানের রাজকুমারকে।

শেষ সূর্যের মরা আলোয় এমন একটা মোহ থাকে যা মনকে মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেই মোহময় আলোয় প্রাসাদ চত্বরে রেশমী রাজকুমারকে হাতির পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াতে দেখল।

খুব বিচার করে দেখলে এমন কিছু সুদর্শন পুরুষ নন বসুধর্মা। কিন্তু সাদা রেশমী বস্ত্র আর জামদানী মেরজাইতে রাজপুত্রকে ভারী সুন্দর মানিয়েছিল। গলায় ছিল দু'নরী মুক্তোর মালা। পীতাভ দেহবর্ণের ওপরে ঐ মুক্তোমালাটি দেখে মনে হচ্ছিল, ভোরের সোনালী রোদ্দুরের গায়ে ফুটে আছে সার সার শিশির বিন্দু।

রেশমীর বাবা মেয়েকে নিয়ে যেতে এলেন চার দিন পরে। কিন্তু এই চারদিনের ভেতরেই রেশমী নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল।

রাজকুমারের সঙ্গে কিছু কথা, কিছু মেলামেশা হয়েছিল তার। সবটুকু যোগাযোগ ঘটানোর মূলে ছিল রেশমীর বান্ধবীটি।

একদিন রাজকুমার বসুধর্মা রেশমীর সামনেই তার বান্ধবীকে বললেন, আরাকানের ভাবী রানী হবার যোগ্য নারী এতদিন আমার চোখে পড়েনি, এখন আমি তাকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

রেশমী অতি সংকোচে আর লজ্জায় নীচু করল তার মাথা।

বান্ধবী হাসতে হাসতে তার অঞ্জলির ভেতর রেশমীর মুখখানা তুলে ধরল। অমনি রেশমীর চোখ গিয়ে পড়ল রাজকুমারের চোখে।

তিনি ভারী সুন্দর একটি হাসি উপহার দিলেন বোনের বান্ধবীকে।

রেশমীরা তিনজনে একদিন একটি হাতির পিঠে চেপে ছোট-খাটো শিকারে বেরিয়েছিল। সেদিন ওরা দেখেছিল, তীরধনুকে রাজকুমারের লক্ষ্যভেদের দক্ষতা। উড়ন্ত পাখি আর ছুটন্ত খরগোশ ওঁর তীরের ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তে পাথর বনে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ শিকারটি করতে যখন উনি উদ্যত হয়েছেন তখন রেশমী হঠাৎ ওঁর হাতটি চেপে ধরল। উনি অবাক হয়ে রেশমীর দিকে তাকালেন। চোখে প্রশ্ন চিহ্ন।

রেশমী কাতর গলায় বলল, বড় নিশ্চিন্তে মগ্ন হয়ে গাছের ডালটিতে বসে আছে কবুতর দুটি, দয়া করে তীর ছুঁড়ে ওদের বিচ্ছিন্ন করবেন না।

রেশমীর কথার মর্যাদা রাখলেন আরাকানের রাজকুমার। ঐ দিনই বসুধর্মা তাঁর অঙ্গুলি থেকে একটি বহু মূল্যের হীরকাঙ্গুরীয় খুলে পরিয়ে দিলেন রেশমীর অনামিকায়। বললেন, একে সামান্য একটি অঙ্গুরীয় বলে মনে কর না, এর অলৌকিক কিছু ক্ষমতা আছে।

রেশমী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাজকুমারের দিকে।

বসুধর্মা বললেন, এটি যার অঙ্গুলিতে থাকবে মৃত্যুর আগে তাকে অবশ্যই আরাকানের মাটিতে ফিরে আসতে হবে। আমার প্রপিতামহকে এই অঙ্গুরীটি দিয়েছিলেন এক বৃদ্ধ পুরোহিত। তিনি ছিলেন আরাকানের পর্বতে অধিষ্ঠিত 'মহামুনি'র মন্দিরের সেবক।

রেশমীর বান্ধবী সঙ্গে সঙ্গে বলল, মহামুনি হলেন বুদ্ধ। জংগল ঘেরা পাহাড়ের গায়ে তথাগতের খোদাই করা মূর্তি। ইনি আরাকানবাসীদের প্রাণের দেবতা।

এবার রাজকুমার ঐ অঙ্গুরীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, এই মন্ত্রপূত অঙ্গুরীটি থাকে সাধারণত রাজমহিষীর হাতে। মহারাজ শিকারে অথবা যুদ্ধে গেলে মহারানী ঐ অঙ্গুরীয় তাঁর

অঙ্গুলিতে পরিয়ে দেন। এর উদ্দেশ্য, মহারাজ অবশ্যই এই অঙ্গুরীর শক্তিতে বিপদমুক্ত হবেন এবং ফিরে আসবেন আপন রাজ্যে।

রেশমী অঙ্গুরীয়টি লাভ করে অভিভূত হয়েছিল। সে বসুধর্মার দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এমন ঘটনা কি আরাকান রাজ পরিবারে ঘটেছে?

একাধিকবার। আমার প্রপিতামহ একবার শিকারে গিয়ে এই অঙ্গুরীয়ের শক্তিতে রক্ষা পেয়ে যান নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

রেশমী সম্পূর্ণ ঘটনাটি জানার জন্য উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে আছে দেখে বসুধর্মা বললেন, মহারাজ একটা ঘোড়ার ওপর চড়ে একাই জঙ্গলের ভেতর তীরধনু নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভৃত্য এবং সঙ্গীরা প্রবল বাদ্যধ্বনি তুলে তাড়া করে আনছিল জানোয়ারদের। হঠাৎ মহারাজ দেখলেন, কৃতান্তের মত এক বন্য হস্তি জঙ্গলের গাছ-পালা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে।

মহারাজকে সামনাসামনি দেখে সে সহসা থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রচণ্ড শব্দে বন কাঁপিয়ে শুঁড় তুলে এগিয়ে আসতে লাগল।

মহারাজ ধনুকে তীর সংযোজন করে ছুঁড়তে গেলেন কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে গেল তাঁর অশ্বটি। সে লাফিয়ে উঠল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন মহারাজ। শুধু তাই নয়, ছিটকে পড়লেন বন্য হাস্তীটির একেবারে পায়ের কাছে।

আশ্চর্য! এত প্রকাণ্ড বন্য হস্তী, তার একটি পা মহারাজের মাথার ওপর তুলেও সরিয়ে নিল। তারপর শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে তুলে নিল নিজের পিঠে।

মহারাজের লোক লস্কর দূর থেকে হাতিটিকে দেখতে পেয়ে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে অনুমান করে ছুটে আসছিল অস্ত্র উঁচিয়ে। মহারাজ ঐ হাতির পিঠে চেপে হাত নেড়ে ওদের শান্ত হতে বললেন। শেষে ঘোড়া ছেড়ে ঐ হাতিতে চেপেই ফিরলেন রাজধানীতে।

রেশমীর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর, সত্যিই আশ্চর্য এক ঘটনা!

রাজকুমার বললেন, আমার পিতামহের সময়েও এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেও এক শিকার পর্বের সময়। একটা ঘাসের জমিন ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল বিষধর একটা সাপ। ছোবল মারার

আগেই কে যেন মহারাজের কানে কানে বললেন, একটা পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। মহারাজ তাই করলেন। সাপটা তাঁর গা বেয়ে উঠে গলা জড়িয়ে মাথার ওপর ফণা ধরে রইল কতক্ষণ। তারপর প্রায় নিস্পন্দ মহারাজকে ছেড়ে নেমে চলে গেল।

রেশমী বলল, বড় অলৌকিক এ ঘটনাগুলি।

যুবরাজ বললেন, এই অঙ্গুরীয়ের শক্তি বহুবার নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে পরীক্ষিত। শেষবার পরীক্ষা হয়ে গেছে আমার পিতাকে নিয়ে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল রেশমী, কি রকম?

রাজকুমার বললেন, কয়েক বছর আগে ব্রহ্মদেশের রাজার সঙ্গে আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমার পিতৃদেব ব্রহ্মদেশের রাজার সম্পদ আর সৌভাগ্যের প্রতীক একটি শ্বেত হস্তী লাভ করেন। সেই হস্তীকে এখন আরাকানে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে রাখা হয়েছে। এখন শোন অঙ্গুরীর মাহাত্ম্যের কথা।

পিতৃদেব যুদ্ধ করতে করতে প্রবল বেগে ধেয়ে চললেন শত্রু সৈন্যের ব্যূহের দিকে। হঠাৎ আরাকানী সৈন্যেরা পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল।

ব্রহ্মদেশের একজন সৈনিক পিতৃদেবকে পশ্চাৎ থেকে আঘাত করবার জন্য তার শাণিত কুঠারটি শূন্যে তুলেছে। মুহূর্তমাত্র। এরপর আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন মহারাজ।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, আততায়ীর হাত থেকে সেই উদ্যত অস্ত্রটি খসে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আততায়ীও শুকনো পাতাটির মত ঝরে পড়ল।

আরাকানী সৈন্যেরা ততক্ষণে তাকে ঘিরে ফেলেছে। কেউ মানুষটাকে আঘাত করেনি, তবে সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলই বা কেন! নেড়ে চেড়ে দেখা গেল, দেহে প্রাণ নেই। সবাই অনুমান করল, যে মুহূর্তে মানুষটা অস্ত্র তুলেছিল সেই মুহূর্তেই প্রবল সন্ন্যাস-রোগে সে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগেই বেরিয়ে যায় প্রাণবায়ু।

রেশমী বলল, প্রতিটি ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু যুবরাজ আপনার পিতা বর্তমানে এই আশ্চর্য অঙ্গুরীয়টি আপনার হাতে এল কি করে ?

যুবরাজ বিমর্ষ মুখে বললেন, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পিতা অত্যন্ত উদাসী হয়ে পড়েছেন। একদিন আমাকে কাছে ডেকে অঙ্গুরীয়টি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে এ অঙ্গুরীয়র মর্যাদা তোমাকেই রাখতে হবে।' সেই থেকে আমিই ভার বইছি।

রেশমী অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বলল, এই অমূল্য রত্নটি আপনি হঠাৎ আমার হাতে তুলে দিলেন কেন যুবরাজ ? এর ভার বইতে পারি, এমন শক্তিতো আমার নেই।

যুবরাজের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, আরাকানের রাজবধূরাই সাধারণত এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তোমার হাতে দিলাম এ কারণে যে, তুমি যেখানেই থাক মহামুনির অধিষ্ঠানভূমিতে তোমাকে একদিন আসতে হবেই হবে।

যুবরাজের কথা শুনে সংকোচে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল রেশমী।

কিন্তু আশ্চর্য। ভাগ্যের দেবতা অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে উত্তোলন করলেন তাঁর নির্মম দণ্ডটি।

প্রথম দুঃসংবাদ এল আরাকান থেকে। মহারাজ সুধর্মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবিলম্বে যুবরাজের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন।

পরদিনই যুবরাজ বসুধর্মার জাহাজ পাল তুলে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ ভেদ করে ধেয়ে চলল আরাকান অভিমুখে।

পক্ষকাল পরে এল দ্বিতীয় দুঃসংবাদ। মহারাজের মৃত্যু হয়েছে। নিজের মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি দুটি জরুরী কর্ম সম্পাদন করে গেছেন। আরাকানের প্রধান শ্রেষ্ঠী, কালকের কন্যা উর্বরীকে পুত্রবধূরূপে বরণ করে এনেছেন রাজগৃহে। সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনের অধিকারও দান করেছেন একমাত্র পুত্র বসুধর্মাকে।

সারিকা সংবাদ পাওয়ামাত্র শিবিকা যোগে চলে গেল রেশমীর আস্তানায়। বান্ধবীর জন্য বুকের মধ্যে দাহ।

রেশমী বাবা মার কাছে গোপন রেখেছিল তার প্রণয়-সংবাদ।

তাই ডাক্তার ফার্নান্ডেজের বাড়ীতে সৌজন্য বিনিময়ের পর দুবান্ধবীতে চলে গেল কর্ণফুলীর তীরে।

সারিকা বলল, আমি এখনও স্থির করতে পারিনি কিভাবে শুরু করব আরাকান থেকে পাওয়া খবরগুলো।

রেশমীর চোখেমুখে উদ্বেগের ছায়া। সে বলে উঠল, মহারাজ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তো?

সারিকা মাথা নীচু করে বলল, তিনি গত হয়েছেন। এখন সিংহাসনে বসেছে যুবরাজ বসুধর্মা।

রেশমী বেদনার্ত গলায় বলল, মহারাজকে দেখার সৌভাগ্য থেকে আমি চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হলাম।

একটু থেমে আবার বলল, তোমার দ্বিতীয় খবরটির জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁকে জানাবার কথা তিনি যখন সামনে নেই তখন তাঁর ভগ্নীর কাছেই নিবেদন করলাম। তিনি যথাস্থানে এই খবরটুকু পৌঁছে দিলে আমি কৃতার্থ হব।

এবার সারিকা রেশমীর হাতটি ধরে ফেলল। তার হাত অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় কাঁপছিল।

কি হল তোমার সারিকা? মুখখানা এমন ম্লান হয়ে গেল কেন? হাতের মুঠি কেঁপে কেঁপে উঠছে!

সারিকা রুদ্ধ গলায় বলল, একটা খবর আমার বুক ঠেলে উঠে আসতে চাইছে কিন্তু আটকে যাচ্ছে আমার গলায়। কিছুতেই তাকে প্রকাশ করতে পারছি না, তাই যন্ত্রণায় কেঁপে উঠছে আমার সারা শরীর।

রেশমী মনে মনে উদ্বিগ্ন হল। তবু সে নিজেকে সংযত রেখে বলল, সারিকা, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। তোমার যে কোন কষ্টকে আমি আমার নিজের কষ্ট বলেই মনে করি। তুমি কোন সংকোচ মনের মধ্যে না রেখে কি হয়েছে খুলে বল।

সারিকা কান্নাভেজা গলায় বলল, ভারী কষ্ট হবে তোমার সেকথা শুনলে। একেবারে সহ্য করতে পারবে না তুমি।

রেশমী স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, আমার মা শুধু একটি কথা আমাকে শিখিয়েছেন, সুখে দুঃখে স্থির থাকার চেষ্টা করবে। ভেঙে পড়বে না কখনও।

সারিকা কাতর গলায় বলল, মরবার আগে মহারাজ সুধর্মা পুত্রবধূর মুখ দেখতে চেয়েছিলেন। তাই সেখানকার শ্রেষ্ঠী কালক তাঁর একমাত্র কন্যা উর্বরীকে যুবরাজ বসুধর্মার হাতে সমর্পণ করেন।

সামান্য সময় মাথা নীচু করে নিজের আবেগকে সংযত করল রেশমী। একসময় মাথা তুলে বলল, খবরটুকু শোনা ছাড়া আমার তো কোনকিছু করার নেই সারিকা। বাবা সেদিন একটা কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে যে যেতে চায় সে শুধু আঘাত খেয়েই মরে।

সারিকা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আমি ভাবতেই পারিনি আমার দাদা বসুধর্মা এ বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে। সে সত্যটাকে মহারাজের কাছে প্রকাশ করতে পারত।

রেশমী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আমরা কেউই পরিস্থিতির মুখোমুখি ছিলাম না, তাই ওঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করাটা বোধহয় সঠিক হবে না। আমি মনে করি না, তাঁর মত একজন বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ শ্রেষ্ঠীর অর্থের লোভে একাজ করেছেন। আমার মনে হয় মুমূর্ষু মহারাজের কাতর মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

সারিকা উত্তেজিত হয়ে বলল, অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার স্থৈর্য দেখে। আমি হলে কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না।

এর কোন উত্তর দিল না রেশমী। কিছুক্ষণ পরে শান্ত গলায় সে শুধু বলল, হীরাকাঙ্গুরীয়টি সযত্নে আমি গচ্ছিত রেখেছি আমার অতি গোপনীয় পেটিকার মধ্যে। তুমি আমার বাড়ীতে চল। ওটি তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আর মুক্ত হতে চাই!

সারিকা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল,তুমি ব্যস্ত হয়োনা রেশমী। ওটা যখন তোমাকে দিয়েছে তখন তোমার কাছেই থাক। মানুষটা ভারী আবেগপ্রবণ আর সরল। তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হয়, মুমূর্ষু মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বিয়েটা না করা ছাড়া ওর উপায় ছিল না।

কথা বলতে বলতে ভারী হয়ে উঠল সারিকার গলা। সে তার পোশাকের প্রান্ত তুলে ভেজা চোখের পাতা মুছে নিল।

রেশমী বুঝল, সারিকা তার দাদাকে খুবই ভালবাসে, তবে আকস্মিক এই বিপর্যয়ে তার কোমল মনে বড় ব্যথা লেগেছে। নিরপরাধ রেশমীর এতবড় ক্ষতি সে কোনমতেই সইতে পারছে না।

আরাকান থেকে শেষ দুঃসংবাদটি এল দুমাস পরে। মংগৎ রাইয়ের কাছে খবরটি বয়ে নিয়ে এলো আরাকানী এক যুবক। মর্মান্তিক, প্রায় অবিশ্বাস্য। সেদিন মৃত্যুপুরীর মত মনে হল মংগৎ রাইয়ের প্রাসাদ। দীপ জ্বলল না, শোনা গেল না বুদ্ধ তথাগতের মন্দিরে পুজার বাদ্যধ্বনি।

নিহত হয়েছেন নবীন সূর্যের মত প্রদীপ্ত মহারাজ বসুধর্মা। সিংহাসন অধিকার করে বসেছে এক ভৃত্য। রানীর পিতৃগৃহে প্রতিপালিত উর্বরীর পূর্ব প্রণয়ী সে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করে এনেছে সেই যুবক।

বিবরণে প্রকাশ, শ্রেষ্ঠী কালকের গৃহে একসময় নিযুক্ত হয় একটি তরুণ ভৃত্য। সুচতুর এই পরিচারকটি তার বুদ্ধিবলে অচিরেই হয়ে ওঠে কালকের প্রিয়পাত্র। তরুণ ভৃত্যটি ধীরে ধীরে বুঝে নিতে থাকে কালকের বিশাল ব্যবসা-সাম্রাজ্যের পথ পদ্ধতি। অল্প সময়ের মধ্যেই সে শ্রেষ্ঠীর কাছে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলে।

শ্রেষ্ঠী কালকের ব্যবসায়ের প্রধান দুটি বস্তু আসত অরণ্য থেকে। একটি গজদন্ত, অন্যটি পুরাতন বৃক্ষ। প্রায় দশখানি জাহাজ শ্রেষ্ঠীর এই সকল সম্পদ নিয়ে হাজির হত দেশ বিদেশের বন্দরে বন্দরে। প্রভূত অর্থ উপার্জন হত এর থেকে। যুদ্ধকালে প্রয়োজন পড়লে মহারাজকেও শ্রেষ্ঠী কালকের কাছে হাত পাততে হত। মন্ত্রী, সেনাপতি সকলেই ছিলেন কালকের কাছে ঋণী।

কালকের সুচতুর ভৃত্যটি নির্ভীকতার সঙ্গে যেমন হিংস্র পশুসংকুল অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করে সম্পদ সংগ্রহ করে আনত তেমনি অন্তঃপুরের গোপন প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলে মিলিত হত কালকের মাতৃহারা কন্যাটির সঙ্গে।

এই অবৈধ মিলনের ফলে গর্ভবতী হয় কালকের কন্যা উর্বরী। কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় উর্বরী পরিকল্পনা করে গৃহ-

ত্যাগের। ঠিক সেই সময়েই আরাকান রাজগৃহ থেকে আসে বিবাহের প্রস্তাব।

কন্যার অবৈধ প্রণয় ও পদস্খলন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না শ্রেষ্ঠী কালক। তিনি সাগ্রহে ও সানন্দে বসুধর্মার হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন।

একে রাজ পরিবারের বধূ হবার আনন্দ, অন্যদিকে অবৈধ সন্তান জনিত দুশ্চিন্তার অবসান,—এই দুয়ে মিলে পরম নিশ্চিন্ততার ভেতব নিজেকে সঁপে দিয়েছিল উর্বরী। কিন্তু সাময়িক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর ভুল ভাঙল তাব। সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাব্য লগ্নের সঙ্গে বিবাহেব কালটিকে কোনভাবেই গণনায় মেলাতে পাবল না সে। তখন আবার প্রবলতর দুশ্চিন্তার শিকার হল উর্বরী।

এবার সে পিতৃগৃহে যাত্রা করে তার পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে বসল পরামর্শে।

শ্রেষ্ঠী কন্যার প্রণয়ী পুন্থক বলল, এখন দুজনের আরাকান ছেড়ে যাবার পরিকল্পনা বাতুলতা মাত্র। সহস্র চোখেব সতর্ক দৃষ্টিতে ধবা পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। তার চেয়ে তোমার আপত্তি না থাকলে একটা দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যেতে পারে।

কি সে কাজ?

শিকারে প্রলুব্ধ করে মহারাজ বসুধর্মাকে গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়া।

তাতে আমাদের সমস্যা সমাধানের কি পথ খুলবে?

বসুধর্মা নিহত হবেন বাঘের থাবার আঘাতে।

কিভাবে তুমি এটা অনুমান করতে পারছ?

অনুমান নয়, এ ঘটনা ঘটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। পরবর্তী কাজের ভার তোমাকেই বইতে হবে উর্বরী।

বল কি করতে হবে আমাকে?

তোমার বাবার কাছে তুমি সবকিছু স্বীকার করে যাবে। তোমাকে তোমার বাবা কঠিন তিরস্কার করলেও ফেলে দিতে পারবেন না। এদিকে উত্তরাধিকারী ছাড়া আরাকানের সিংহাসন অরক্ষিত হয়ে পড়বে। তখনই তোমার উদ্যোগে আর শ্রেষ্ঠীর

সম্পদের প্রভাবে আমি হতে পারব আরাকানের অধীশ্বর। তুমি আগের মতই বসবে মহারানীর আসনে। নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করব আমরা। আমাদের সন্তানরাই হবে ভাবী উত্তরাধিকারী।

পন্থক তার পরিকল্পনা মতই কাজ করল। মহারানীর প্ররোচনায় বসুধর্মা গেলেন জঙ্গলের গভীরে শিকার করতে। সেখানে পন্থকের কথায় নির্ভর করে দেহরক্ষী পর্যন্ত সঙ্গে নিলেন না মহারাজ।

পন্থকের সঙ্গে ছায়াসঙ্গীর মত থাকত তার এক যুবক বন্ধু। কেবল তার কাছেই পন্থক বলত তার মনের কথা। সে জানত উর্বশী আর পন্থকের প্রণয়ঘটিত প্রতিটি ঘটনা। কিন্তু মহারাজকে হত্যার পরিকল্পনাটি গোপন রাখা হয়েছিল তার কাছ থেকে।

হাতি ধরার জন্য জঙ্গলের গভীরে ছিল শ্রেষ্ঠী কালকের একটি অতি মনোরম অরণ্য-নিবাস। পন্থক মহা সম্মান দেখিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলল মহারাজ বসুধর্মাকে।

পরদিন প্রভাতেই শিকার পর্ব। হাতি ধরার মানুষগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লাঠি-সোঁটা, ঢাকঢোল ইত্যাদি দিয়ে। তারা জঙ্গলটা ঘিরে ফেলে সামনের দিকে জানোয়ারগুলোকে তাড়াতে শুরু করল। তাদের প্রবল হাঁকডাক আর বাদ্যধ্বনিতে ভয়ংকর একটা সোরগোলের সৃষ্টি হল।

পন্থক বসেছিল চালকের আসনে। মাহুত হিসেবে তার যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। মহারাজ শিকারীর বেশে বসেছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট জায়গাটিতে।

এদিকে পন্থক আগেই তার বন্ধুটিকে জঙ্গলের এক ঘন পত্রবহুল গাছের ওপর বসিয়ে রেখে এসেছিল। তার ওপর নির্দেশ ছিল, হাতিটি তাকে পার হয়ে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে ডালপালার আড়ালে থেকে একটা বিশেষ ধরনের পাত্র মুখে নিয়ে বাঘের ডাক ডাকবে। কড়া নির্দেশ ছিল, তার এই পরিকল্পনার কথা অন্য কেউ যেন কোন ভাবেই জানতে না পারে।

সেই মত কাজ হল। দূর থেকে ভেসে আসছিল মানুষজনের কোলাহল। কয়েকটা হরিণ বিদ্যুতের ঝলক হেনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাতি এগিয়ে চলল জঙ্গল চিরে। হঠাৎ বাঘের গর্জন শোনা গেল। শব্দটা ভয়ংকর তরঙ্গ তুলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। বহু মানুষের কানে গিয়ে পেঁছিল সেই বিকট আওয়াজ।

পন্থক মুহূর্তে হাতিটিকে থামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে মহারাজ, জঙ্গল চিরে বাঘটা আপনার ঠিক পেছন দিকে চলে গেল।

মহারাজ হাতের অস্ত্র তুলে দ্রুত পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ধারাল থাবা এসে পড়ল তাঁর ঘাড়ে। মাথাটা লুটিয়ে পড়ল বুকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মত তিনি ঢলে পড়লেন হাওদার ওপর।

পন্থক বিপুল শক্তিতে দেহখানা তুলে ঠেলে ফেলে দিল কোমর অব্দি উঁচু ঘাসের জঙ্গলে।

অদূরে গাছের ওপর বসে সমস্ত ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করল পন্থকের বন্ধু সুধন্য বর্মা। সে দেখল হাতিটি থেমে গেল। একটু পরেই মহারাজ হাতে একখানা ভল্ল নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে পিছু ফিরলেন। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পন্থক। ও স্পষ্ট দেখেছে, পন্থক তার বাঘনখ অস্ত্রটি দিয়ে মোক্ষম আঘাত হানল মহারাজ বসুধর্মাকে।

সমস্ত ঘটনাটা এমনি আকস্মিক ও অভাবনীয় যে সুধন্য গাছের ওপর বসে কাঁপতে লাগল। তার মনে হল পন্থক মানুষরূপী একটা নৃশংস নরখাদক ছাড়া কিছু নয়।

একটু পরেই ও নামল গাছ থেকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল হাতিটির কাছে। ওকে আসতে দেখে হাতি থেকে লাফ দিয়ে নামল পন্থক।

এতক্ষণ তুমি গাছের ওপরে ছিলে!

সুধন্য গম্ভীর গলায় বলল, হ্যাঁ।

সব ঘটনা নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে।

সুধন্য অস্বীকার না করে মাথা নাড়ল।

পন্থক মুহূর্তে কিছু ভেবে নিল। তারপর মহারাজের ভল্লটি তুলে সজোরে গেঁথে দিল মাটিতে। উদ্দেশ্য, যখন মানুষজন এসে পড়বে তখন তারা বুঝবে, মহারাজ বাঘটিকে লক্ষ্য করে ভল্ল

ছুঁড়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে বাঘটি তাঁকে টেনে নিয়ে যায় বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু পন্থক আর সুধন্যের ক্রমাগত আক্রমণে বাঘ মহারাজের দেহ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

পন্থক আদেশ দেবার গলায় বলল, সুধন্য, মহারাজের দুটো পা ধরে ঘাসের জমিনের ওপর দিয়ে জঙ্গলের ঐ বড় গাছটা অব্দি টেনে নিয়ে যাও।

পন্থকের প্রেমঘটিত ব্যাপারগুলো সুধন্যের অগোচর ছিল না। কিন্তু এই ঘটনা সুধন্যের সারা দেহমনে একটা ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দিল। তবু সে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পন্থকের কথার প্রতিবাদ করল না। মহারাজের রক্তঝরা দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘাসের জমিনের ওপারে।

এবার তার কাছে এগিয়ে এল পন্থক। বন্ধুত্বের সুরে সুধন্যের কাছে বলে গেল তার সমস্ত পরিকল্পনার কথা।

শেষে বলল, উর্বরী ছাড়া আমাকে এই মুহূর্তে সাহায্য করার আর কেউ নেই। তুমি আমার পাশে থাক বন্ধু, উদ্দেশ্য সফল হলে তুমি হবে আমার প্রধান পরামর্শদাতা।

এত ঘৃণা আর দুঃখের ভেতরেও হাসি পেল সুধন্যের। সে একটি বাক্য উচ্চারণ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ শোনা গেল মানুষজনের কোলাহল। তারা বাঘের গর্জন শুনে ভীত হয়ে পড়েছিল। মন্থর হয়ে গিয়েছিল তাদের গতি। কিছুক্ষণ বিরতির পর এখন তারা এগিয়ে আসতে লাগল কোলাহল করে।

পন্থক এতক্ষণে মহারাজের দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। সে মাঝে মাঝে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলার অভিনয় করছে। তার পাশে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুধন্য। সে নির্বাক, নিশ্চল।

পন্থকের মুখে আনুপূর্বিক মিথ্যা ঘটনা শুনে মানুষগুলো বিমূঢ় হয়ে পড়ল। শেষে পন্থকের নির্দেশে সকলে সযত্নে ধরাধরি করে হাতির পিঠে তুলল মহারাজের দেহ। বন্য ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হল তাঁর দেহের ওপর। একটা শোক মিছিল বাতাসে প্রবল ঢেউ তুলতে তুলতে এগিয়ে চলল রাজধানী অভিমুখে।

আশ্চর্য পরিকল্পনা-কুশলী মহারানীর প্রেমিক এই পন্থক। পক্ষকালের মধ্যেই ভাগ্যের দেবতা তার শিরে তুলে দিলেন আরাকানের রাজমুকুট। নির্লজ্জ রানী অভিষেক লগ্নে সমবেত সভাসদ ও বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথিদের দৃষ্টির সামনে প্রথামত মহারাজের বাম পার্শ্বের সিংহাসনে উপবেশন করল। ঠিক পরদিনই সূর্যোদয়ের পূর্বে একটি দ্রুতগামী নৌকায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল সুধন্য।

সুবেদার মংগৎ রাই সুধন্যের মুখে আরাকানের ভয়াবহ দুর্যোগের খবর পেয়ে প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরদিন তিনি পাত্রমিত্রদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। আলোচনাকালে জ্বলে উঠল প্রতিশোধের আগুন। শেষে স্থির হল, মংগৎরাই নিজেকে চট্টগ্রামের স্বাধীন নৃপতিরূপে ঘোষণা করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করবেন আরাকানের বিরুদ্ধে একটি নৌ-অভিযান।

পরিকল্পনা মত প্রেরিত হল ক্ষুদ্র একটি নৌবহর। কিন্তু সেই বহরের একটি নৌকোও আরাকানের তীরভূমি স্পর্শ করতে পারল না। বহরের তিন চতুর্থাংশ নৌকো বিধ্বস্ত ও নিমজ্জিত হল বঙ্গোপসাগরের গর্ভে। এবার আরাকানের বিশাল নৌবহর ধাবিত হল চট্টগ্রাম অভিমুখে।

হাওয়ায় উড়ে এল সেই ভয়াবহ দুঃসংবাদ। জলোচ্ছ্বাসের মত উত্তাল হয়ে উঠল আতংক-তরংগ। প্রায় দশহাজার বন্দী দাস-দাসী এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। ফিরিঙ্গিরা এতকাল প্রয়োজনে মংগৎ রাইয়ের বাহিনীতে গোলন্দাজের কাজ করে এসেছে। আরাকান অভিযানেও তারা এবার মংগৎ রাইয়ের পক্ষ নিয়েই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। কিন্তু যখন শুনল মগরা এগিয়ে আসছে প্রতিশোধ নেবার জন্য তখন তারা যত শীঘ্র সম্ভব পরিবার পরিজন নিয়ে জাহাজ বোঝাই হয়ে পাড়ি দিল বাংলাদেশ আর গোয়া অভিমুখে। দাসদাসীদের দিকে তাকাবার ফুরসতই রইল না তাদের।

হতভাগ্য দাসদাসীরা তখন মুক্তির আনন্দে আত্মহারা। তারা স্থানীয় নৌকোর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রওনা হয়ে গেল স্বদেশের দিকে।

মংগৎ রাই স্থলপথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইতিমধ্যে তিনি

বাংলাদেশে আশ্রয় চেয়ে সীমান্ত ঘাঁটি জগদীয়ার থানাদারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। অল্প সময়ের ভেতরেই সম্মতি-পত্র এসে গেল।

সপরিবারে চৌদ্দটি হাতির পিঠে ধন দৌলত চাপিয়ে মংগৎরাই ডাঙাপথে চললেন মোগলদের রাজ্য, বাংলাদেশে। তিনি ন'হাজার আজ্ঞাবহ সঙ্গী নিয়ে যখন ঢাকায় পেঁছিলেন তখন সেখানকার সুবেদার তাঁকে আশ্রয় দিলেন বিশেষ সমাদরে।

চট্টগ্রাম পরিত্যাগের সময় মংগৎরাই সপরিবারে ডাক্তার ফার্নান্ডেজকে সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রস্তাবটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন ফার্নান্ডেজ সাহেব। সারিকা বেশমীব হাত ধরে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য সেধেছিল, কিন্তু মা বাবাকে ফেলে সে একা যেতে চাইল না। অলক্ষ্যে থেকে নির্মম ভাগ্যদেবতা একবার শুধু বাঁকা হাসিটি হাসলেন।

শিশু-ভবনের বিশ-পঁচিশটি অসহায় ছেলেমেয়েকে ফেলে কেমন করে পালাবেন ডাক্তার ফার্নান্ডেজ। তিনি কুসুমকে দাসদাসীদের সঙ্গে তার দেশে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কুসুম স্বামীপুত্রের কথা ভেবেও যেতে চায়নি। এতগুলি ছেলেমেয়ের ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল তার। তাছাড়া বাবা মা বোনকে বিপদের মাঝে ফেলে সে কি করেই বা একা পালাবে।

এদিকে প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর। প্রতি পল পার হতে লাগল ভয়ংকর ঘূর্ণির মেঘ মাথায় নিয়ে। যে কোন মুহূর্তে সেই মেঘ ভেঙে পড়ে ভাসিয়ে দেবে সারা চট্টগ্রাম।

জেলে নৌকোর মুখে মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যাচ্ছিল। দূরে নাকি দেখা যাচ্ছে সাদা পাল, কালো জাহাজের সারি।

ডাক্তার ফার্নান্ডেজ আর বুকের মধ্যে সাহস ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি প্রথম ভেবেছিলেন যুদ্ধের জন্য মগ সৈন্যরা চট্টগ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও এই শিশুদের কোন ক্ষতিই তারা করবে না। কিন্তু হিংস্র মগদের নির্মমতার খবর বার বার তাঁর কানে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন বাংলাদেশে।

চার বৈঠার একখানা নৌকো যোগাড় করা হল। অপরাহ্নের

কিছু আগেই শিশু-ভবন থেকে ছেলে মেয়েদের নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে দ্রুত পায়ে আসতে লাগল কুসুম আর রেশমী। ডাক্তার ফার্নাণ্ডেজ আর তাঁর স্ত্রী তখনও শিশু-ভবনে ছেলেমেয়েদের জিনিস পত্র গোছগাছের কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের প্রাণফাটা একটা আর্তনাদ শোনা গেল। তখন নৌকোর খোলটি ভরে উঠেছে অনাথ শিশুদের কলরবে।

প্রথম শব্দটা শুনেছিল কুসুম। সে শিশু-ভবনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল। রেশমী এবং নৌকোর মাল্লারা চমকে ফিরে তাকাল সেদিকে।

হা হা করে বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যাচ্ছিল রেশমী, তাকে মাল্লারা জোর করে ধরে নিয়ে এসে ফেলে দিল নৌকোর খোলে। সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইল সেখানে।

শেষ সূর্যের আলোয় শিশুভবনের প্রাঙ্গণে সেদিন অভিনীত হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের একটি নাটক। এক দয়ালু নিরীহ দম্পতিকে ঘিরে উদ্যত হল কয়েকটি তরবারি। দিনান্তের আলোয় ঝলসে উঠল সেগুলো।

দীর্ঘদেহী পুরুষটি তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত হাত নেড়ে ইংগিত করে চললেন, নৌকোটি দ্রুত ছেড়ে দেবার জন্য। আর নারীটি নতজানু হয়ে করজোড়ে কি যেন প্রার্থনা করে চললেন ঘাতকদের কাছে।

শেষ সূর্য দিগন্তে মিলিয়ে যাবার আগে কর্ণফুলির জলে ঢেলে দিল একরাশ রক্ত। সেই রক্তের ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল ঘাতকদের তরবারি।

জ্ঞান ফিরলে রেশমী বুঝতে পারল নৌকোর পাটাতনের ওপর তাকে শোয়ান হয়েছে। সে তাকিয়ে দেখল আকাশে জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্র। নৌকোর গা থেকে উঠে আসছে ঢেউ ভাঙার ছলছল শব্দ।

রেশমী ছেলেবেলা থেকেই গভীর আর চাপা প্রকৃতির মেয়ে। সে আবেগ উচ্ছ্বাসের ভেতর দিয়ে কখনও প্রকাশ করেনি তার সুখ

দুঃখের অনুভূতি। তাই বাবা আর মায়ের নির্মম হত্যাকান্ডের সময়ে সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল।

সে জানে না, আরাকানী সৈন্যরা বাবা মাকে হত্যা করার পর ছুটে আসছিল তাদের নৌকো লক্ষ্য করে। মাল্লারা সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিল নৌকো। মগরা কিছুক্ষণের ভেতরেই তাদের এক খানা নৌকোয় চেপে ওদের অনুসরণের চেষ্টা করে। কিন্তু রেশমীদের নৌকোর অভিজ্ঞ মাল্লারা ঐ অঞ্চলের নদী নালা আর খাঁড়িগুলির সন্ধান জানত। তারা অনুসন্ধানকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

অনেক রাত্তিরে যখন চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায় তখন নক্ষত্র দেখে তারা যাত্রা করে গন্তব্যস্থলের অভিমুখে।

বাংলাদেশে পেঁছে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখী হল রেশমী। বাবা মায়ের মৃত্যু তার বুকে পাষাণ-ভার চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই পাষাণের ওপর দিয়ে যখন বইতে লাগল করুণার নির্ঝর তখন সে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়ল।

মাল্লাদের মুখে যখন বাংলাদেশের মানুষরা শুনল, রেশমীর বাবা মা এই পঁচিশটি শিশুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তখন শিশুগুলিকে সাদরে বুকে তুলে নিল মায়েরা। তারা তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিল সাগ্রহে।

সংবাদ পেঁছে গেল কুসুমের সংসারে। ছেলে বউকে নিয়ে যেতে একদিনের পথ নৌকোয় চেপে এলো কুসুমের বর। স্বামীর বুকে আছড়ে পড়ে, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকাশ ভাঙা কান্না কাঁদল কুসুম। শেষে যখন শান্ত হল পরিস্থিতি তখন কুসুম আর তার বর রেশমীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে থানাদারের লোক এসে গিয়েছিল। তারা রেশমীর পরিচয় পেয়ে এবং তার সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে তাকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে নিয়ে গেল থানাদারের আস্তানায়। যাবার আগে কুসুমকে অনেক প্রবোধ দিয়ে, নিজের গলার একটি দামী মালা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় নিল রেশমী।

থানাদার কাসিম আলি রেশমীর সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন, অনেক উঁচু ঘরের এই তরুণীটি ভাগ্য বিপর্যয়ে এসে পড়েছে।

এখানে। তিনি মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সেনাপতি ইসলাম খানের ডেরায়।

ইসলাম খান উদ্ধত মগদের শাস্তি দেবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেছিলেন। বাড়ীতে নোকর নোকরানীদের নিয়ে গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন বেগমসাহেবা।

কাসিম আলি বেগম সাহেবার পূর্ব পরিচিত। আলিসাহেব যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, বেগম সাহেবা, এই অসহায় মেয়েটিকে কোথাও রাখাব সাহস না পেয়ে আপনাব কাছেই এনে ফেলেছি। এর বাবা মা দুজনেই মগদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। কতকগুলি অসহায় শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন ওঁরা দুজনে।

মাথায় করাঘাত করে বেগমসাহেবা গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

তিনি রেশমীকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, খানদানি ঘরের জেল্লা আছে এর মুখে, আঁখ থেকে মমতা ঝরছে। আলিসাহেব, এর ভার নিলাম আমি। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

কাসিম আলি চলে গেলেন তাঁর কর্তব্য সমাধা করে। বেগমসাহেবা নোকরানী দিয়ে রেশমীকে পাঠালেন গোসলখানায়।

দুই মেয়ে খানসাহেবের। বিয়ের পর তারা চলে গেছে অনেক দূরের শ্বশুর বাড়িতে। এতবড় বাগান আর বাড়ী তাই খাঁ খাঁ করে। রেশমীকে কাছে পেয়ে বেগমসাহেবা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

তিনি গোসলখানায় পাঠিয়ে দিলেন ছোট মেয়ের জন্য বানিয়ে রাখা একপ্রস্থ দামী পোশাক। মনে মনে ভেবে খুশী হলেন, এ পোশাকে মেয়েটিকে মানাবে ভাল।

দু'এক দিনের ভেতরেই নিজের ব্যবহারের গুণে রেশমী বেগমসাহেবার মন জয় করে নিল। রেশমী বেগমকে যখন আম্মা বলে ডাক দেয় তখন বেগমসাহেবার বুকের ভেতর স্নেহ উথলে ওঠে।

ইসলাম খানের সঙ্গে তখনও দেখা হয়নি রেশমীর কিন্তু সেই অদেখা মানুষটিকে রেশমী কথায় কথায় বাবাসাহেব বলতে শুরু করে দিল।

এদিকে আরাকানী মগসৈন্যদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইসলাম খান।

আরাকানীরাও যুদ্ধে নেমেছিল যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে। তারা সঙ্গে করে এনেছিল রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই পাঁচটি জাহাজ। পাঁচশো জালিয়া নৌকো আর দেড়শো ঘুরাব (টহলদারী নৌকো) নৌকোয় বোঝাই হয়েছিল আরাকানী সৈন্যরা।

তারা সুসজ্জিত নৌবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ভুলুয়া আর শ্রীপুরের খাঁড়ির দিকে।

ইসলাম খান খিজিরপুরের মোহনার দুদিকে সমাবেশ করলেন তাঁর বিপুল বাহিনী। বাঁশ আর মাটি দিয়ে নদীর দুধারে তৈরী হল চারটি কেল্লা। তাদের ওপর তুলে বসান হল কয়েক সারি কামান। মুসলমান গোলন্দাজদের সঙ্গে এসে যোগ দিল চট্টগ্রাম থেকে আগত ফিরিঙ্গি গোলন্দাজরা।

কয়েকদিন ধরে চলল বিপুল বিক্রমে গোলাবর্ষণ। ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগল আরাকানবাহিনী। শেষে বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে দেশে ফিরে গেল তারা।

মগদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ঘরে ফিরে এলেন বিজয়ী সেনাপতি। অভিনন্দনের বন্যা বয়ে গেল কয়েকদিন। রাজকর্মচারীরা আসতে লাগল ভীড় করে। খানাপিনার ব্যবস্থা হল এলাহি।

দুদিনেই খানসাহেবের বাড়িতে মধ্যমণি হয়ে উঠল রেশমী। বিশিষ্ট কোন অতিথি এলেই খানসাহেব রেশমীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, এ আমার সবচেয়ে ছোট বেটী।

প্রতিটি কাজে সেবার মনোভাব আর সুগঠিত সুন্দর মুখে সুশ্রী হাসি রেশমীকে সবার প্রিয় করে তুলল।

রেশমীর ছোট্ট বুকে কান্নাও ছিল, কিন্তু সে কখনও তা বাইরে প্রকাশ করত না। রাতের অন্ধকারে সে যখন বিছানায় তার দেহটাকে এলিয়ে দিত তখনই একটা অশ্রুর নদী বয়ে যেত অবিরল ধারায়। বাবার স্নেহমাখা মুখ, মায়ের আকুল প্রতীক্ষাকাতর দুটি চোখ তাকে বিহ্বল করে তুলত। আর একখানি মুখ সে কিছুতেই ভুলতে পারত না। যে মুখের মালিক এক অরণ্য-বৃক্ষের তলায় তার অঙ্গুলিতে পরিয়ে দিয়েছিল একটি অঙ্গুরীয়।

আশ্চর্য এক ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল রেশমী। সামান্য একটু-খানি সুখের সূর্যোদয় হতে না হতেই কালো মেঘে ঢেকে যেত তার আকাশ। ভাগ্যের দেবতা অলক্ষ্যে বসে হা হা করে নিষ্ঠুর হাসিটি হেসে উঠতেন।

জামাতার সঙ্গে হঠাৎ ইসলাম খানের ছোট মেয়েটি এসে পেঁছিল বাপের বাড়ি।

'শিরিন' নামের অর্থটি যেন জড়িয়ে আছে নামধারীর সঙ্গে। মিষ্টি, মধুর। যেমন মিষ্টি হাসি তেমনি মধুর ব্যবহার ইসলাম খানের এই মেয়েটির।

প্রথম দিনেই তার ভাব হয়ে গেল রেশমীর সঙ্গে। বাপজানের ওপর কপট রাগে ফেটে পড়ল, রেশমীকে তার চেয়ে বেশী ভালবাসে অপবাদ দিয়ে। অন্দরে বাগানে যেখানেই যায় হাত ছাড়ে না রেশমীর। খাওয়া, শোয়া, গল্প হাসি গানে মেতে ওঠা সবই একসঙ্গে।

বাগানের একটি নিভৃত ঘরে যেদিন রেশমীর নাচ দেখল শিরিন সেদিন মাথা ঘুরে গেল তার। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত থেকে একটি অলংকার খুলে পরিয়ে দিল রেশমীর হাতে।

রেশমী চমকে উঠল, কিন্তু কোন রকম প্রতিবাদ করতে পারল না। তার চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা জল।

ব্যস্ত হয়ে উঠল শিরিন, তুমি কাঁদছ রেশমী! আমি আমার ঐ প্রিয় মুক্তো বসানো গয়নাটি তোমাকে বড় ভালবেসে দিয়েছি।

রেশমী বলল, তুমি কিছু মনে কর না ভাই, কেউ উপহার দিলে অনেক সময় আমি তার মর্যাদা রাখতে পারি না। তাই এত বড় ভালবাসার দান আমার চোখে জল এনে দিয়েছে।

একটি সুখবর বয়ে এনেছে ইসলাম খানের জামাতা শ্বশুরের কাছে।

ঘটনাটি এই, ইসলাম খানের বেয়াই সইফুদ্দীন সাহেব সম্রাট শাজাহানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। সম্রাটের ইচ্ছাতেই তিনি বিহার প্রদেশে প্রধান কাজীর পদে অধিষ্ঠিত। এখন ইসলাম খানের বহুদিনের বাসনা, তিনি দিল্লী অথবা আগ্রা প্রাসাদ ও নগরী রক্ষার দায়িত্ব ভার লাভ করেন।

বেয়াই সইফুদ্দীন সাহেব সে কাজটি এতদিনে সম্পন্ন করেছেন। আর সে খবরটি বয়ে নিয়ে এসেছে ইসলাম খানের জামাতা।

অবিলম্বে সপরিবারে ইসলাম খান চলে যাবেন আগ্রা প্রাসাদে। সেখানে প্রাসাদের অভ্যন্তরেই সস্ত্রীক থাকতে হবে তাঁকে। নিয়ম অনুযায়ী বাইরের কোন নোকর নোকরানী থাকবে না তাঁর সঙ্গে। প্রাসাদের নির্দিষ্ট সেবক সেবিকারাই সম্পন্ন করবে তাঁর প্রাত্যহিক কাজ। একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা থাকার অনুমতি পাবে পিতা-মাতার সঙ্গে। জাহানারা বেগমের পরামর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন হবে সমস্ত কর্ম।

ইসলাম খান বড় ভালবেসে ফেলেছিলেন রেশমীকে। কিন্তু তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না ভেবে বড়ই দুঃখিত হলেন।

মুশকিল আসান করতে এগিয়ে এল ইসলাম খানের মেয়ে শিরিন। অবশ্য স্বামীর কাছ থেকেই সে পেয়েছিল পরামর্শ।

কাজী সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই তাঁর বিশ্রামের সময় একান্ত আপনজন কেউ কাছে থাকলে তিনি বড়ই তৃপ্তি পান। এতদিন পুত্রবধূ শিরিনই তাঁর সেবা করে এসেছে, এখন শিরিন সন্তান-সম্ভবা। তাই তার পক্ষে আর বেশীদিন শ্বশুরমশায়ের সেবা করা সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় রেশমীর মত একজন আপনার লোক কাছে থাকলে সবদিক থেকেই সুবিধে।

অতএব শিরিন রেশমীকে সঙ্গে নিয়ে চলল শ্বশুরালয়ে। ইসলাম খান ও বেগম সাহেবা রেশমীকে ছেড়ে দিয়ে মনে মনে বড় কষ্ট পেলেন। কিন্তু আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে মেয়েটাকে অসহায়ের মত ঘুরতে হবে না দোরে দোরে।

মেয়ে জামাই রেশমীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবার দুদিন পরেই আক্রাম খাঁর ওপর দায়িত্ব ভার দিয়ে সস্ত্রীক ইসলাম খান চলে গেলেন আগ্রা।

রেশমী পাটনাতে পৌঁছে কাজী সাহেবের সেবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিল। দু'দিন যেতে না যেতেই অভিজ্ঞ কাজী-সাহেব বুঝলেন, মেয়েটি সেবার প্রতিমূর্তি। অন্তরে মমতা না থাকলে কারু পক্ষেই সম্ভব নয় এমনভাবে সেবা করা।

তিনটি মাস কেটে গেল রেশমীর কাজী সইফুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে। শয়নগৃহের বাতায়নটি খুলে দিলেই গঙ্গার নিরন্তর প্রবাহটি চোখে পড়ত। জ্যোৎস্না রাতে আপন মনে সে চেয়ে থাকত গঙ্গার দিকে। তরঙ্গ শীর্ষে ঝিকমিক করত রুপোলী চন্দ্রালোক। সে নিজের খেয়ালে কখনও নাচত কখনও বা গান করত।

সইফুদ্দীন সাহেবের স্নেহ, শিরিনের পাগল করা ভালবাসা রেশমীকে দিয়েছিল নতুন জীবনের এক স্বাদ। সে ছিল কৃতজ্ঞ, সে ছিল সুখী। তার তরঙ্গিত বুকের ওপর ফুটে উঠেছিল আনন্দের রক্তকমল।

কিন্তু একটি লুব্ধ মধুপিয়াসী ভ্রমর নিরন্তর তাকে স্পর্শ করার লোভে উড়ে উড়ে ফিরত। নানা ছলে সে চেষ্টা করত তার উত্তপ্ত সান্নিধ্য লাভ করার।

খালীল যদি শিরিনের স্বামী না হত তাহলে এতদিনে রেশমীর তীক্ষ্ন ছুরিতে বিদ্ধ হয়ে যেত কামনায় ক্লেদাক্ত ভ্রমরের হৃৎপিণ্ডখানা।

যখনই সে খালীলের নির্লজ্জ ব্যবহারে উত্যক্ত আর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত তখনই তার চোখের ওপর ফুটে উঠত একটি আশ্চর্য মুখ। সদা আনন্দিত, সরল সংশয়মুক্ত সে মুখের ছবি। অমনি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসত তার ক্রোধ। সত্যই শিরিন তাকে একেবারে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

চতুর্থ মাসে একটি অঘটনের মুখোমুখি হতে হল রেশমীকে। এই ঘটনায় আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল রেশমীর জীবনের স্রোত।

কাজী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ইউসুফ এলাহাবাদে সরকারী কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত ছিল। কোন একটি সমস্যায় পীড়িত হয়ে সে তার বাবার পরামর্শ চেয়ে বিশেষ বার্তাবাহক পাঠিয়েছিল।

কাজী সাহেব লিখিত উত্তর না দিয়ে এলাহাবাদে স্বয়ং উপস্থিত হবেন স্থির করলেন।

খালীল পিতার সঙ্গী হতে চাইল। বজরা যাবে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত। পথে পড়বে বারাণসী। সেখানে নেমে যাবে খালীল। উদ্দেশ্য, একমাত্র বোন আনজুমের সঙ্গে দেখা করা। আবার যখন

কাজী সাহেবকে নিয়ে বজরা ফিরবে তখন বারাণসী থেকে সেই বজরা ধরে ফিরে আসবে খালীল।

কাজী সাহেব শিরিনকে বললেন, মা, আমি যদি রেশমীকে সঙ্গে নিয়ে যাই তাহলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে ?

শিরিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আমি ওকে আপনার সঙ্গে পাঠাব বলে অনেক আগে থেকেই ভেবে রেখেছি। ও সঙ্গে থাকলে আপনার সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি হবে না। তাছাড়া ও নৌকোয় যাবে, নৌকোয় ফিরবে, অসুবিধে কোথায়।

আমি তোমার অসুবিধের কথা ভাবছি মা।

শিরিন বলল, কোন অসুবিধে নেই বাবা, আপনারা নিশ্চিন্তে যান। আমাদের কাজের লোকদের ওপর পুরোপুরি ভরসা আছে আমার।

কাজী সাহেব সপুত্র রেশমীকে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ভারী আনন্দের যাত্রা ছিল এটি। নদী ছুঁয়ে কত জনপদ কত জীবনযাত্রার ছবি। কাজী সাহেব যেন শিশুটি হয়ে গেলেন। নদী তীরে চাষীরা কাজ করছিল, তিনি তাদের হাঁকডাক করে নৌকোর কাছে ডাকলেন। ক্ষেতিতে আনাজপত্র, ফলপাকড় যা হয়েছে তার খোঁজখবর নিলেন। বেশ কিছু কিনে তোলা হল বজরায়। শেষে তাদের হাতে অতিরিক্ত কিছু কড়ি দিয়ে বললেন, মেঠাই কিনে বাচ্চাকাচ্চাদের খাওয়াবি।

নদীতে জাল ফেলছে জেলেরা। তাদের কাছ থেকে মাছ কিনে নিচ্ছেন। কত রকমের জাল আর মাছ ধরার সরঞ্জাম আছে তার খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ভাবটি এমন, যেন এখুনি নেমে পড়বেন ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে।

সন্ধ্যের আগে নদী তীরের বিশাল বটগাছে পাখিরা ফিরে এসে কলরবে মেতে উঠেছে। কাজী সাহেব নৌকো বাঁধলেন সেখানে। তীরে নেমে রেশমীর হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। হাত তুলে একটি একটি করে পাখি চেনাতে লাগলেন রেশমীকে। ছেলেবেলা কেমন করে বনে বাদাড়ে ঘুরতেন, পাখিদের পেছন পেছন ছুটতেন, তার ফিরিস্তি দিতে লাগলেন কাজী সাহেব।

এমনি আনন্দ হাসিগল্পের ভেতর দিয়ে বজরা এসে পেঁৗছল বারাণসীতে। কাজী সাহেবের ছেলে খালীল নেমে গেল সেখানে। ফিরতি বজরায় ওকে তুলে নেওয়া হবে।

খালীল নেমে যাবার পর অনেকখানি স্বস্তি ফিরে এল রেশমীর। এ কদিনে কাজী সাহেবের দৃষ্টির আড়ালে যখনই সে খালীলের জন্য খাবার কিংবা জল নিয়ে গেছে তখনই খালীল চেপে ধরেছে তার হাত। হাঁ করে চেয়ে থেকেছে তার মুখের দিকে। বিন্দু বিন্দু কামনার ক্লেদ ঝরে পড়েছে তার চোখের দৃষ্টি থেকে।

রেশমী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেছে কাজী-সাহেবের ঘরে। সে কারু কাছে প্রকাশ করতে পারেনি তার গোপন যন্ত্রণার কথা। ঘরে সে একমাত্র শিরিনের কাছেই জানাতে পারত তার মনের এই অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো। কিন্তু এতে লাভ হত না কোন পক্ষেরই। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য ঘব ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হত রেশমীকে অনির্দিষ্ট পথে। অথবা শিরিন তাকে জোর করে ধরে রাখতে চাইলে ঘরে জ্বলে উঠত নিত্য কলহের আগুন।

এলাহাবাদে পেঁৗছে গেল বজরা। নদীর কাছেই ইউসুফের আস্তানা। কাজী সাহেবের এই ছেলেটি ভিন্ন ধাতুতে গড়া। বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু নিজেকে শিক্ষায় দীক্ষায়, কর্মকুশলতায় যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি এতদিন।

রেশমী দেখল, ইউসুফ তাকে বাবাব পরিচারিকা এক সাধারণ মেয়ে হিসেবে দেখছেনা। বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা নীচু করে তার সঙ্গে কথা বলছে। আবার মহিলাশূন্য ঘরে রেশমীর কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু ঘটনার স্বাভাবিক মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে গেল। ছোট ছেলের পদোন্নতির ব্যাপারে কাজী সাহেব দিল্লীতে বাদশার কাছে চললেন দরবার করতে। সঙ্গী হল ইউসুফ।

যাবার আগে সইফুদ্দীন সাহেব পাটনা অভিমুখে রওনা করিয়ে দিলেন বজরা। মাল্লাদের নানারকম হুঁশিয়ারী দিয়ে দিলেন। বারাণসী থেকে বড় ছেলে খালীলকে তুলে নেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রধান মাল্লাকে।

রেশমীকে কাছে ডেকে একটা আশরফি বোঝাই থলে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আমাকে জরুরী কাজে দিল্লী যেতে হচ্ছে মা। তুমি এটা গোপনে তোমার কাছে রেখে দাও। প্রয়োজনে খরচ করবে।

রেশমীর বজরা পাল তুলে দাঁড় টেনে চলল পাটনার দিকে। এখন স্রোতের অনুকূলে গতি বাড়ল বজরার। ছোট্ট ঘরটির ভেতর বসে রেশমী তাকিয়ে রইল দিগন্তের দিকে। যত বারাণসী লক্ষ্য করে বজরা এগোতে লাগল ততই অনাগত একটা আশঙ্কা তাকে ঘিরে ধরল। দিগন্তের কোল থেকে একটা অশুভ মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আকাশে।

বারাণসীর বিশেষ একটি ঘাটে নৌকো বেঁধে খবর পাঠান হল খালীলের কাছে।

বোনের বাড়ী থেকে কাল বিলম্ব না করে বেরিয়ে এল খালীল। বাপজান নৌকোয় নেই, সে কথা সে মাল্লার মুখ থেকে আগেই জেনেছিল। শিকার অরক্ষিত এবং হাতের মুঠোয় জেনে সে মহানন্দে লাফিয়ে উঠল বজরায়। রেশমীর খোঁজে প্রথমেই ঢুকল ঘরের ভেতর। সম্ভ্রমে, সংকোচে সরে দাঁড়াল রেশমী।

বাপের বিছানার ওপর বসে শুরু করল বোনের বাড়ীর গল্প। কত রকম জিনিস খেয়েছে এবং কত গল্প করেছে তারই ফিরিস্তি।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রেশমী শুনছিল এইসব অনাবশ্যক কাহিনী। মাঝে মাঝে তার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল একটা ভয়, কি জানি হঠাৎ কোন দিক দিয়ে সে আক্রান্ত হয়।

আশ্চর্য! মধ্যাহ্নে আহারের সময় আগের মত কোন অঘটন ঘটালোনা খালীল। হাত ধরা তো দূরের কথা, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়েও রইল না। খেতে খেতে কেবল বলল, এ তো মাল্লাদের রান্না বলে মনে হচ্ছে না, এতে রেশমী সুন্দরীর শ্রীহস্তের ছোঁয়া লেগেছে।

রেশমী কোন কথা না বলে কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

কি, ঠিক বলিনি?

এবার কথা বলল রেশমী, আপনাকে আর কিছু দেব কি ?

না না, শুধু পেট ভরে নয়, মন ভরে খেয়েছি। অনেক বেলা হল, খেতে বসে যাও তুমি।

রেশমী ভাবল, এ কি সুবাতাস বইছে নাকি। বোনের বাড়ী থেকে ফিরে খালীল সাহেব কি বদলে গেল।

একসময় মুছে গেল দিনের আলো। নৌকো নোঙর ফেলল মাঝ গঙ্গায়। অপরিচিত জায়গায় নদী তীরে নোঙর ফেলতে মাল্লারা সাহস করল না। জায়গাটা জংগলাকীর্ণ, তাছাড়া বড় বড় গাছপালা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আছে। ওগুলো দস্যু তস্করের ঘাঁটি হওয়া বিচিত্র নয়।

আঁধার ঘনিয়ে উঠল। আকাশে চাঁদ নেই। কৃষ্ণপক্ষের ঘনঘোর রাত্রি। নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে আকাশে। এ যেন সহস্র চক্ষু রাত্রিব রহস্যময় দৃষ্টিপাত।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকল তাড়াতাড়ি। খালীল বজরার এক-প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রধান মাল্লাটির সঙ্গে অনুচ্চে কি যেন পরামর্শ করছিল।

কাজী সাহেবেব পায়ের কাছে খাটিয়ার নীচে মেঝেতে বিছানা করে শুতো বেশমী। বাইবে পাটাতনের ওপর ফরাস পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকত খালীল। আজ বিছানা করতে গিয়ে রেশমী পড়ল দোটানায়। নিজে শোবে ঘরের ভেতর আর খালীল পড়ে থাকবে বাইরে, সেটা কেমন করে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত রেশমী মুখোমুখি হল খালীলের।

ভেতরে আপনার বিছানা পেতে দি ?

খালীল বলল, বেশ তো, তোমাব যেমন ইচ্ছে।

রেশমী কাজী সাহেবেব বিছানাটি খালীল সাহেবের জন্য ঝেড়ে ঝুড়ে তৈরী ক'রে রাখল।

একসময় ঘবের বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, আপনার শোবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

খালীল সাহেব পায়ে পায়ে ঘবের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রেশমী তার সামান্য বিছানাটা এক ফাঁকে টেনে সরিয়ে রেখেছিল পাটাতনের ওপর।

খালীল দেখল ঘরের ভেতর রেশমীর বিছানা নেই। সে অমনি বলে উঠল, কি হল? তোমার বিছানাটা পাতনি কেন?

কেঁপে উঠল রেশমীর বুক। সে চাপা গলায় বলল, আপনি আপনার আব্বাজানের বিছানায় নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন, আমি দরজার বাইরে পাটাতনের ওপরেই শোব।

অসম্ভব! তুমি শোবে তোমার জায়গায়, আপত্তি থাকলে আমিই চলে যাব বাইরে।

সমস্যায় পড়ে গেল রেশমী। সে জোর গলায় এর প্রতিবাদ করতে পারল না। বজরার খোলে বসে তখন তামাক খাচ্ছিল মাল্লারা। তাদের কানে এসব কথা গেলে অশোভন হয়ে উঠবে সমস্ত পরিস্থিতি। তাই খালীলকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে নিজের বিছানাটা বজরার কুঠীর ভেতরেই পেতে নিল।

এসব স্বচক্ষে দেখে খালীলসাহেব গা এলিয়ে দিল বিছানায়। ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বলছিল কুঠীর জানালার তলায়। খালীল বলল, রেশমী, আলোতে আমার ঘুম আসে না, তুমি কি প্রদীপটা নিভিয়ে দেবে?

রেশমী কোন কথা না বলে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল আলোর শিখাটা। দরজা ভেজান থাকলেও খিলটা খুলে রেখেছিল রেশমী। সে দরজার কোলেই তার বিছানাটা পেতে নিয়েছিল।

এখন ঘর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সন্ধ্যা থেকেই শিরশিরে শীত পড়েছে। তাই খালীলের ইচ্ছায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জানালাটিও।

এই সুযোগে খাটিয়ার তলায় রাখা পেঁটরার ভেতর থেকে রেশমী তীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা প্রায় নিঃশব্দে বের করে আনল।

এবার সে শুয়ে পড়ল তার বিছানায়। ঘুম এল না চোখে। সে জানে আরও কটি রাত তাকে কাটাতে হবে এখানে। আর রাতের পর রাত জেগে বসে থাকা সম্ভব নয় কারু পক্ষে। তবু প্রথম রাতের দুঃস্বপ্ন এড়াবার জন্য সে চোখ মেলেই শুয়ে রইল।

এমনি কতক্ষণ কেটে গেল নীরবে। রাতের প্রকৃতি কিন্তু নির্বাক নেই। জঙ্গলের জটাজালে আলোড়ন তুলে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল গঙ্গার এপার থেকে ওপারে। হঠাৎ পাখিগুলো ঘুম থেকে

জেগে উঠে শুরু করে দিল ভীষণ কলরব। তাদের মনে হল, নিশাচর কোন কৃষ্ণসর্প অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দে উঠে আসছে, তাদের গ্রাস করার জন্য।

কি, ঘুমোলে নাকি?

সজাগ রেশমী, তবু কোন সাড়া দিল না। কপট ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

খালীল খাটিয়ার ওপর উঠে বসল। অন্ধকারে জ্বলছে তার চোখ। রেশমী শুয়ে শুয়েই বোঝার চেষ্টা করল খালীলের অবস্থান।

আর একবার চারপাইয়ের চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর। রেশমী বুঝলো খালীল নেমে দাঁড়িয়েছে মেঝের ওপর।

ও এবার আন্দাজ করে এগিয়ে আসছে। কাঠের মেঝেতে অতি ধীর পদক্ষেপেও সাড়া জাগছে। একটা বাঘ যেমন থাবা চেপে চেপে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে আসে শিকারের কাছে তেমনি পায়ে পায়ে এগোচ্ছে খালীল।

রেশমীর সারা শরীর ভিজে উঠেছে ঘামে। সে উত্তেজনায় এবার উঠে বসল। হাতের মুঠোয় শক্ত করে বাগিয়ে ধরল ছোরাখানা।

বসেছে খালীল। এত কাছে যে তার গরম নিশ্বাসের শব্দ, স্পর্শ সবই পাওয়া যাচ্ছে।

এবার পাখির সন্ধানে উঠে আসা সাপের মত অন্ধকারে হিল্ হিল্ করে এগিয়ে এল লম্বা একখানা হাত।

রেশমী চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার। এক পা এগিয়েছ কি বুকের ভেতর গেঁথে যাবে ছোরাখানা।

বলতে বলতেই রেশমী বাঁহাত পেছনে চালিয়ে দরজার পাল্লাটা খুলে ফেলল। তার চিৎকারে উঠে পড়ল মাল্লারা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল একটা মশাল।

পিছু হটতে হটতে বজরার কিনারা পর্যন্ত এসে গেছে রেশমী। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছে তার, তবু সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরে আছে ছোরার ফলাখানা।

এখন মশালের আলোয় সমস্ত দৃশ্যপটই পরিষ্কার।

হঠাৎ খালীল সবাইকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠল,

পাকড়ো, পাকড়ো। শয়তানি আমাকে অন্ধকারে চাকু মেরে খুন করার মতলব করেছিল।

মাল্লাদের মোড়ল ততক্ষণে একটা সড়কি হাতে তুলে নিয়েছে। মালিকের হুকুম পেলেই গেঁথে দেবে।

খালীল তাকে হাতের ইঙ্গিতে বারণ করল।

রেশমী ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে, তার পক্ষে এ বজরাতে থাকা আর সম্ভব নয়। সে শুধু বলল, খালীলসাহেব, ছি ছি ছি। আসমানের পবিত্র তারার মত বিবি পেয়েও যার মন ভরে না তার স্থান দোজখেও নেই। জেনে রেখ, শিরিনই আজ রক্ষা করল তোমাকে আমার হাত থেকে। তার সরল, নিষ্পাপ মুখখানার কথা মনে করেই তোমাকে জানে মারতে পারলাম না।

রেশমী কথাগুলো উচ্চারণ করেই তার হাতের ছোরাখানা তীব্র ঘৃণায় ছুঁড়ে মারল খালীলের দিকে। ছোরার তীক্ষ্ম ফলাটা গেঁথে গেল কাঠের ঘরের দরজার মাথায়।

হতচকিত খালীল প্রাণের আতংকে লাফিয়ে উঠে পাটাতনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

রেশমী শুধু বলল, ভীতু, কাপুরুষ।

পরক্ষণেই সে লাফিয়ে পড়ল অন্ধকার গঙ্গার বুকে।

জলের ওপর ভারী জিনিস লাফিয়ে পড়ার শব্দ, বজরার ওপর মাল্লাদের হৈচৈ, সব মিলে অন্ধকার রাত্রির বাতাসকে তরঙ্গিত করে তুলল।

প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়েই জলের অনেকখানি তলায় তলিয়ে গেল রেশমী। তারপর স্রোতের টানে আর নিজের শক্তিতে জল কেটে উঠে এল ওপরে। চট্টগ্রামের নদী, পুকুরে সাঁতার কেটে ওস্তাদ সাঁতারু হয়ে উঠেছিল রেশমী। কিন্তু একে গভীর রাত, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তার ওপর প্রবল উত্তেজনায় রেশমী প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। লাট খেতে খেতে ভেসে গিয়েছিল অনেকখানি দূরে। এখন তার সংবিত ফিরে এল। সে নিজেকে স্রোতের মুখে শুধু ভাসিয়ে রাখল। জল কেটে কোন দিকে এগোবার কোন রকম চেষ্টাই করল না। স্রোত তাকে নিজের গতিতে বয়ে নিয়ে চলল

নিজের পথে। সে শুধু মাঝে মাঝে পায়ের ধাক্কায় জল সরিয়ে নিজেকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে লাগল।

উত্তেজনায় শীতের অনুভূতি ছিল না রেশমীর। এখন তার হাড় মজ্জা কাঁপাতে লাগল শীত।

কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথির চাঁদ জেগে উঠে অবাক চোখে দেখতে লাগল এক পঞ্চদশী কন্যাকে। সে তার কিছুটা আলো ছড়িয়ে দিল জলের ওপর আর কিছুটা চরের চকচকে পলিতে।

রেশমীর হঠাৎ মনে হল, একটা কি যেন আলো তার দৃষ্টির ওপর এসে পড়ল, পরক্ষণেই তা সরে গেল। সে বেশ বুঝতে পারল, এ অন্তরীক্ষের আলো নয়, এই পৃথিবীরই আলো। রেশমী সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে পিছলে যাওয়া আলোটাকে ধরার চেষ্টা করল।

হ্যাঁ, সে গঙ্গার একটি কূলের অনেক ধার দিয়ে চলেছে। আর ঐ কূলেই এক টুকরো আগুন জ্বলছে। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে জায়গাটা। তাই রেশমী সাঁতার কেটে বয়ে চলা স্রোতের বিপরীতে যাবার চেষ্টা করল। সে তার সবটুকু শক্তি উজাড় করে এক সময় উঠে এল নদীর চরে। পরক্ষণেই ভেঙে পড়ল ক্লান্তিতে। অর্ধচেতন অবস্থায় সে কতক্ষণ পড়ে রইল চরের জমিনে।

কে তুমি মা এখানে পড়ে আছ?

কেউ যেন কিছু বলছে। দূরাগত একটা ধ্বনির মত কানে এসে বাজছে অর্থহীন কতকগুলো শব্দ।

এবার দীর্ঘদেহী পুরুষটি তরুণীর মাথার কাছে বসে পড়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের ভেতরেই তিনি আশ্বস্ত হয়ে উঠে গেলেন তাঁর উপবেশনের স্থানটির পাশে। একটা বিশাল বটগাছের তলায় খানিকটা পরিষ্কার জায়গা। সেখানে সাধু মহারাজের সাধনার আসনটি পাতা। কম্বল, কমণ্ডলু, একটি কাপড় চোপড় রাখার পোটলা পড়ে আছে। একটি পেতলের ঘটিতে সামান্য দুধ রয়েছে। কলার পাতায় কয়েকটি কাটা ফল।

পাশেই ধুনি জ্বলছে। কাঠ পুড়ছে, চড়চড় শব্দ উঠছে তার থেকে।

তিনি পোঁটলা খুলে একখণ্ড গেরুয়া কাপড় ও একটি ঝোলা

পিরান বের করলেন। ওগুলি গুছিয়ে নিয়ে তিনি আবার এলেন চরের ওপর লুটিয়ে পড়ে থাকা মেয়েটির কাছে।

ততক্ষণে রেশমী উঠে বসেছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে কিন্তু শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে।

সাধুবাবা কাছে এসে অত্যন্ত কোমল গলায় বললেন, তোমার কোন ভয় নেই মা। ছেলের কাছে যখন এসে পড়েছ তখন নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে থাকতে পার। এখন ভেজা কাপড়গুলো ছেড়ে উঁচু ঢিবিটার কাছে উঠে এসো। আগুন জ্বলছে, আরাম পাবে। এই নাও শুকনো একপ্রস্ত কাপড়।

রেশমীর মনে হল, মানুষটি ঈশ্বর প্রেরিত। সে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে তার হাত থেকে শুকনো কাপড়গুলো নিয়ে নিল।

সাধুবাবা তাঁর আস্তানার দিকে পা বাড়ালেন। রেশমী কাপড় পরে, পিরানটা গায়ে চাপিয়ে অনেকখানি আরাম পেল। সে পায়ে পায়ে গিয়ে পেঁাছল সাধুবাবার ধুনির পাশটিতে।

সাধুবাবা পেতলের ঘটিটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, ঈষৎ গরম করে নিয়েছি, খাও, আরাম পাবে। মধুও খানিকটা মেশানো আছে। সব ক্লান্তি কেটে যাবে মা, শরীরে নতুন বল পাবে।

রেশমী দুধটুকু খেল। কমণ্ডলু থেকে সামান্য জলও নিল সে খাবার জন্য। তারপর ঘটিটি ধুয়ে আনল গঙ্গা থেকে।

এসেই দেখল, ছোট্ট একটি শতরঞ্চি ধুনির কাছে পাতা রয়েছে। একটি কম্বলও পড়ে আছে তার ওপর।

সাধু বললেন, এবার তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর, আরাম পাবে। ধুনির আগুনে প্রথমে শরীরটা গরম করে নাও, তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড। পরে তুমি চাইলে তোমার আপনজনদের কাছে আমি তোমাকে পেঁাছে দিয়ে আসতে পারি।

রেশমী বলল, এ অঞ্চলে আমার আপনার জন বলতে কেউ নেই বাবা। একজন অসৎ মানুষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য নৌকো থেকে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম।

তোমার চোখে মুখে পবিত্রতার স্পর্শ আছে। তবে মা তোমার ললাটে দুর্গ্রহের স্পষ্ট ছায়া। ভাগ্যের লিখন এড়ানো বড়ই কঠিন। তবু যতদূর সম্ভব সাবধানে সংযতভাবে থেকো।

রেশমী বলল, আমার বাবা মা কটি শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে মগ দস্যুদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। সেই থেকে শুরু হযেছে আমার ভাগ্য বিপর্যয়। এখন আমার আপনজন বলতে একমাত্র আছেন বাবাসাহেব।

তিনি কোথায় থাকেন।

আগ্রায়।

সেখানকার ঠিকানা তুমি জান?

রেশমী বলল, বাবা সাহেবের নাম ইসলাম খান। আগ্রানগরী আর প্রাসাদ রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন তিনি। সেখানে সবাই তাঁর ঠিকানা বলে দিতে পারবে।

সাধুবাবা স্থির হয়ে বসে কিছু ভেবে নিলেন। একসময় রেশমীর দিকে চোখ তুলে বললেন, এলাহাবাদে কুম্ভস্নান শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। প্রতিদিন ভাড়া নৌকোয় পুণ্যার্থীরা যাচ্ছেন এই পথে। তুমি যদি যেতে চাও তাহলে একেবারে ভোবেই তোমাকে নিয়ে রওনা দিতে পারি। ওখান থেকে আগ্রা যাবার অসুবিধে হবে না।

আমি রাজি বাবা।

এলাহাবাদে পুণ্যস্নান সেরে রেশমীরা এক সময় এসে পেঁছিল আগ্রায়। তখন বেলাশেষের রঙ ধরছিল আকাশে। একজন অশ্বারোহীকে দেখে নগর-রক্ষী বলেই মনে হল।

সাধুবাবা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে খিঁচিয়ে উঠল,—

কি দরকার? কোতোয়াল সাহেব এখন মহা ব্যস্ত। একদিকে নগর সামলাচ্ছেন, আর অন্যদিকে বকসীসাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রাসাদ আগলাচ্ছেন। এখন উটকো লোকেব সঙ্গে দেখা করার ফুরসত কই তেনার?

সাধুবাবা আরও শান্ত গলায় বললেন, আপনি শুধু তাঁকে খবব দিন, তাঁর মেয়ে রেশমী এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা কবতে।

লোকটা ঘোড়ার ওপর বসেই মাথাটা কাত করে আর চোখটা কুঁচকে রাস্তার ওপর একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে

দেখে নিল। মনে মনে ভাবল, যেমন খুবসুরত, এ তো খানদানী ঘরের মেয়ে না হয়েই যায় না।

যেই ভাবা, অমনি হাতের ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে ঘোড়া ছোটাল প্রাসাদের দিকে।

কিছু পরে তিন অশ্বারোহী এলো, তাদের পেছনে একটি সুচিত্রিত ডুলি। পূর্বের অশ্বারোহীটিও ছিল ওদের সঙ্গে।

ডুলিটা রেশমীর কাছ ঘেঁষে নামানো হল। তিনজন রক্ষীই এবার নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। সেলাম জানাল রেশমীকে। পূর্ব পরিচিত রক্ষীটি রেশমীর কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে বলল, কৃপা করে ডুলিতে উঠুন।

রেশমী বলল, কিন্তু আমি তো একা নই। আমাব সঙ্গে সাধু-বাবা রয়েছেন।

সাধুবাবা এগিয়ে এলেন রেশমীর দিকে। বললেন, মা আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ইসলাম খান সাহেবের আস্তানার খোঁজ তুমি পেয়ে গেছ। আমি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি ডুলিতে ওঠ, আমি আমার পথে চলে যাই।

রেশমী সাধুবাবার পায়ে হাত ছুঁইয়ে কাঁদতে লাগল।

সাধুবাবা তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, সাধুর কোন মায়া অথবা পিছুটান রাখতে নেই মা। কোন গৃহীর আশ্রয়ে থাকাও তার সাধনার পক্ষে বিঘ্নকর। তুমি আমার জন্যে কিছু ভেব না। ঈশ্বর সব থেকে বড় অতিথিপরায়ণ। তাঁর রাজ্যে স্থান অথবা আহারের অভাব হয় না। তুমি মা হাসি মুখে ডুলিতে ওঠ, আমি নিশ্চিন্তে তাঁর নাম নিয়ে এগোই।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল। রেশমী ডুলিতে উঠে বসল। সাধু দীর্ঘ পা ফেলে ফেলে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেশমীর ডুলি প্রাসাদের তোরণ পেরিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। প্রাসাদ রক্ষী ডুলির সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম খান সাহেবের আস্তানার দিকে এগোতে লাগল।

প্রাসাদের একটি প্রান্তে পাথরের সুন্দর ছোট্ট একখানি বাড়ী। সামনে এক চিলতে বাগান। মরসুমী হরেক রকমের ফুল ফুটেছে। বাগানের মাঝখানে শ্বেত পাথরের সুদৃশ্য একটি ফোয়ারা। ঝির

ঝির করে জলকণা বেশ খানিকটা ওপরে উঠে ঝরে পড়ছে গোলাকার বাঁধানো একটি জলকুণ্ডে। জাফ্‌রি কাটা পাঁচিলের ভেতর দিয়ে চোখ পাতলে দেখা যায়, যমুনা বয়ে চলেছে। তার এক কূলে তৈরী হচ্ছে শ্বেত পাথরে গড়া অদ্ভুত সুন্দর এক স্মৃতি সৌধ। শত শত মানুষ ও শকটের আনাগোনায় স্থানটি সদা কর্মচঞ্চল।

সবুজ ঘাসের জমিনে একটি শ্বেত পাথর নির্মিত কেদারা। তার ওপর বসেছিলেন শিরিনের মা।

আঙিনায় ডুলি নামলে তার থেকে বেরিয়ে এল রেশমী। অমনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিবিসাহেবা রেশমীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

রেশমী সালাম জানাতেই বিবিসাহেবা দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। রেশমী আবেগে, কান্নায় ভেঙে পড়ল তাঁর বুকে।

রেশমীকে জড়িয়ে ধরে বিবিসাহেবা তার পিঠে মৃদু মৃদু স্নেহের করাঘাত করতে লাগলেন।

বেটী কাঁদছিস কেন? তোকে দেখতে না পেয়ে, তোর কোন খবর না পেয়ে আমরা দুজনেই কত আকুল হচ্ছি। এখন চল ভেতরে। সাফসুতোর হয়ে খানাপিনা কর। বাবাসাহেব ডুলি পাঠিয়ে দিয়ে জরুরী কাজে বেরিয়েছেন। এখুনি এসে পড়বেন।

রেশমীকে আর কোন কথা বলতে দিলেন না বিবিসাহেবা। নিজে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ সহ গোসলখানায় ঢুকিয়ে দিলেন।

স্নান সেরে পোশাক পরতে পরতে অন্য একটা ভয় রেশমীকে জড়িয়ে ধরল। সে কি করে আম্মা আর বাবাসাহেবের কাছে তার ঘর ছেড়ে চলে আসার কাহিনীগুলো বলবে। খালীলের দুষ্কর্মের ফিরিস্তি দিতে গেলে এরা কি তা সত্য বলে মেনে নেবেন? যদি মেনেও নেন, নিজের মেয়ের কথা ভেবে কি ও'দের বুক ফেটে যাবে না?

আর না বলেও বা উপায় কি। মিথ্যে গল্প গড়ে তোলা তার পক্ষে কি সম্ভব? মিথ্যেটা তো বেশী দিন টিকবে না। ধরা তাকে পড়ে যেতেই হবে।

মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে সে বেরিয়ে এল গোসলখানা থেকে। বাইরে গলা শোনা গেল বাবা সাহেবের।

রেশমী এগিয়ে এসে সেলাম জানাল বাবাসাহেবকে।

ইসলাম খাঁ সাহেব অনেকদিন পরে ভাল করে দেখলেন মেয়ের মুখখানা। বড় ভালবাসা পড়ে গিয়েছিল মেয়েটার ওপর। ভুলতে পারেন নি ঐ সুন্দর, পবিত্র মুখখানার ছবি।

এতবড় একজন সেনাপতি আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। চোখের কোণে জলের ধারা নামল।

রেশমী বাবাসাহেবের দিকে তাকিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

বিবি সাহেবা পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যে রেশমীকে টেনে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে।

খানাপিনা শেষ হলে তিনজনে গিয়ে বসল একেবারে খান-সাহেবের বিশ্রামের ঘরে। দুচারটে মামুলী প্রশ্নের পর রেশমীর হঠাৎ করে চলে আসার কারণ জানতে চাইলেন খানসাহেব।

বিবিসাহেবা বললেন, তুমি একা কি করে এতদূরের পথ চিনে এলে মা।

প্রথমে আবেগে রেশমীর গলা বন্ধ হয়ে এলো।

খানসাহেব বললেন, আমার শিরিন যেমন তুমিও তেমন মা। কোন সংকোচ না রেখে সব কথা বলে যাও।

বিবিসাহেবা বললেন, শিরিন কি তোমাকে কোন রকম কষ্ট দিয়েছে?

রেশমী সজোরে মাথা নেড়ে বলল, ও সেরকম মেয়েই নয় আম্মা। ওকে বোন হিসেবে পেয়ে আমার আনন্দ আর গর্বের শেষ নেই। যার এমন বাবা মা তার মন কখনও ছোট হবে একথা আমি ভাবতেই পারি না।

খানসাহেব বললেন, তবে তুমি তোমার বোনকে ছেড়ে চলে এলে কেন মা?

রেশমী অবেগভরা গলায় বলল, আমি ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি বলেই ওকে ছেড়ে চলে এলাম বাবাসাহেব।

এরপর রেশমী তার প্রতিদিনের বিপর্যস্ত জীবনের ঘটনা অসংকোচে খানসাহেব ও তার বিবির কাছে বর্ণনা করে গেল।

বলতে বলতে কখনো তার চোখ দুটো ভরে উঠছিল জলে, আবার কখনো ক্ষোভে লজ্জায় সে মাথা নীচু করে নিজের অধর দংশন করছিল।

রেশমীর কথা থামলে পরামর্শ চলল অনেক রাত অবধি।

শেষে স্থির হল, রেশমীর আগ্রা আগমনের কথা কোনভাবেই প্রকাশ করা হবে না। কাজী সাহেবের বাড়ী থেকে অবশ্যই কথা উঠবে, রেশমীর মৃত্যু হয়েছে। সেটাকেই মেনে নিতে হবে।

এরপর আর কোনভাবেই রেশমীর থাকা চলবে না খানসাহেবের বাড়ীতে।

এবার খানসাহেব রেশমীকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? সে যদি সংসারী হতে চায় তাহলে খানসাহেব গোপনে খোঁজখবর নিয়ে তার সব ব্যবস্থাই করে দেবেন।

রেশমী প্রথমেই বাতিল করে দিল তার বিয়ের পরিকল্পনা। সে বলল, যে পায়ে নূপুর পরেছি সে পায়ে আর বেড়ি পরতে পারব না আব্বাজান। আমাদের এই বাবাসাহেব আর আম্মাজানের মত এমন একটি জোড়া ভূভারতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা যখন পাওয়া যাবে না তখন ও পথটা বন্ধই থাক।

ইসলামসাহেব বললেন, তুই কি চাস সারাজীবন নাচগান নিয়েই কাটিয়ে দিবি?

রেশমী বলল, ওটাই আমার জীবনের সেরা ইচ্ছা আব্বাজান। তবে ইচ্ছা হওয়া আর ইচ্ছা পূরণ হওয়া তো আর এক কথা নয়।

এই আলোচনার তিনদিন পরেই ইসলাম খান তাঁর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, রেশমী বেটী, তোর মনের মত কাজ জুটে গেছে, চল আমার সঙ্গে।

জাহানারা তখন ছিলেন আগ্রায়। তাঁকে বলে কয়ে ইসলাম খান রেশমীকে বাদশার হারেমে কাঞ্চনীর দলে ঢুকিয়ে দিলেন। দরবার বসলে বাদশা প্রথমে গিয়ে বসতেন তাঁর সিংহাসনে। তারপর একঝাঁক তরুণী, সুসজ্জিতা কাঞ্চনী দরবারে সারি দিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বাদশাকে কুর্নিশ করে যেত। রাতে বাদশার মেজাজ খোশ থাকলে তিনি কাঞ্চনীদের নাচগান উপভোগ করতেন।

খুশরোজের শেষ দিন শিশ্‌-মহলের প্রাঙ্গণ মাত হয়ে যেত কাঞ্চনীদের নাচে গানে। একমাত্র বাদশা, বেগম আর ওমরাহ পত্নীরা হতেন ঐ উৎসবের দর্শক। বাদশা খুশিমত ইনাম দিতেন যোগ্য কাঞ্চনীদের।

ঐ শিশ্‌-মহলের কাঞ্চনমেলা থেকেই শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনীটিকে নির্বাচন করেছিলেন শুজা। তারপর জাহানারার কাছে আবেদন জানিয়ে রাজমহলের হারেমে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন তাকে।

কিন্তু সেখানে রেশমীর জীবনে ঘটল দ্বিতীয়বার ভাগ্য বিপর্যয়। আর সেই বিপর্যয়ের স্রোতে পড়ে রেশমী তার অর্ধদগ্ধ দেহটাকে নিয়ে উঠল গিয়ে গঙ্গার ওপারে মেহেরুল্লাহ সাহেব আর তাঁর কন্যা আমিনার আশ্রয়ে।

রেশমীর জীবনে এরপর পাঁচটি বছর একেবারে নিস্তরঙ্গ। কেবল পারাবত পরিচর্যা আর তাদের পত্রবাহকের ভূমিকায় পরিচালনার কৌশলটি শিখে নেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না রেশমীর।

রূপের দেবতা হরণ করে নিয়েছিলেন তার সৌন্দর্য কিন্তু হরণ করতে পারেননি তার সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের প্রতিভা। সে গভীর রাত্রে গঙ্গার ধারে বসে গান শোনাতো তার আমিনা দিদিকে। জ্যোৎস্না যখন ঝরে পড়ত চরাচরে তখন আমিনার অনুরোধে সে পায়ে বেঁধে নিত নূপুর। নিশি পাওয়ার মত নিরন্তর ঘুরে ঘুরে নাচত সে। তার নূপুরের ধ্বনি শুনে কল্লোলিত হয়ে উঠত গঙ্গার তরঙ্গ। তার সাদা মসলিনের ওড়নাটি সে যখন উড়িয়ে উড়িয়ে নাচত তখন আকাশের লুব্ধ চন্দ্রমা হাওয়ার অদৃশ্য হাতটি বাড়িয়ে তার ওড়নাটিকে টেনে নেবার চেষ্টা করত।

রেশমীর জীবনে এমনি একদিনে মেহেরুল্লাহসাহেবের ঘরে এলেন এক সম্ভ্রান্ত মানুষ। মেহেরুল্লাহসাহেবের পূর্ব পরিচিত। তবে বহু বছরের অদর্শন।

দুজনে দুজনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর মেহমানকে বসতে আসন দেওয়া হল। মেহেরুল্লাহসাহেব ভেতরে এসে আমিনাকে নিম্নস্বরে আগন্তুকের পরিচয় দিয়ে নাস্তার ব্যবস্থা করতে বললেন।

আগন্তুকের বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই কিন্তু তিনি তাঁর দেহটিকে

এমন সুগঠিত রেখেছেন যাতে তাকে দেখলে পঞ্চাশের উর্ধ্বে বলে মনে হয় না।

একটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্বে আরোহণ করে এসেছেন তিনি। অশ্বটি সুন্দর, সুগঠিত, বিশাল আকারের। ললাট এবং উদরে শুভ্র ছাপ। অশ্বের সাজসজ্জা তার আরোহীর পদমর্যাদাই সূচিত করছে। আরোহীও সুসজ্জিত, দীর্ঘদেহী রাজপুরুষ।

কিন্তু এই রাজপুরুষের সঙ্গে কোন দেহরক্ষী অথবা পরিচারক ছিল না। সম্ভবত মেহেরুল্লাহের সঙ্গে গোপন কোন পরামর্শের জন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে আনেন নি তিনি।

আগন্তুক বললেন, গোয়ালিয়র দুর্গে দিলওয়ার হোসেন এক সামান্য রক্ষী কিন্তু অসামান্য তার বুদ্ধিমত্তা। চতুর্দিকের পরিস্থিতি তার নখদর্পণে। পত্র তারই কাছে যাবে, আর উত্তরও আনতে হবে তার কাছ থেকে।

মেহেরুল্লাহ ঘরের মধ্যে গিয়ে অতিশয় হালকা পালকের আকারের দুটি শক্ত বাকল নিয়ে এলেন। আগন্তুকের হাতে একটি অতি সূক্ষ্ম, তীক্ষ্যাগ্র লেখনী দিয়ে বললেন, সবই তো আপনার জানা। পত্রের শেষে ঠিকানা লিখে দেবেন। গোয়ালিয়রে কপোতটি আমার নির্দিষ্ট লোকের বাড়ীর চিহ্ন দেখে নামবে। ঐ লোকই আপনার চিঠির তলায় ঠিকানা দেখে দিলওয়ার হোসেনের হাতে চিঠি পেঁাছে দেবে। আবার সাদা বাকলটি পালক থেকে খুলে নিয়ে উত্তর লিখে পাঠাবে।

রাজপুরুষ নিবিষ্ট চিত্তে পত্রটি লিখলেন। সমাপ্ত হলে তুলে দিলেন মেহেরুল্লাহসাহেবের হাতে।

মেহেরুল্লাহ বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন, চিঠি গোয়ালিয়রে যাবে। বেশ তাগদওয়ালা অভিজ্ঞ দেখে পায়রা নিয়ে এসো মা।

বোরখায় সারা অঙ্গ ঢেকে রেশমী নীলগিরির একটি রাজকপোত নিয়ে এল। বেশ বড়োসড়ো। মাথা থেকে পুচ্ছ অবধি পাক্কা দেড় হাত। অতি সুদর্শন।

মেহেরুল্লাহের হাতে কপোতটি তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পারাবতটি পছন্দ না হলে বাংলার একটি গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা নিয়ে আসবে।

মেহেরুল্লাহ অভিজ্ঞ চোখে পারাবতটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎ রেশমী চিৎকার করে ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে।

আমিনা ছুটে বেরিয়ে এলো ঘরের ভেতর থেকে।

মূর্ছিত হয়ে পড়েছে রেশমী। আমিনা আবার জল নিয়ে এসে তার মুখে, মাথায় ছিটিয়ে দিতে লাগল।

বাইরের দিকে মেহেরুল্লাহসাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন আগন্তুক রাজপুরুষটি।

এটি কি আপনার কন্যা?

মেহেরুল্লাহ অতিথির অনুসন্ধানের উত্তরে বললেন, না মহাশয়, এটি আমার আপন কন্যা নয়, তবে আপন কন্যার অধিক।

মেয়েটি দেখলাম পারাবত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

ওর প্রবল উৎসাহ দেখে আমি ওকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলেছি।

ও কি মাঝে মাঝে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়?

এর আগে কখনো দেখিনি।

কোথা থেকে পেলেন মেয়েটিকে? বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। এ অঞ্চলের মেয়েরা এই বিশেষ শ্রেণীর পারাবত সম্বন্ধে কৌতূহলী, সাধারণত এটা দেখা যায় না।

মেহেরুল্লাহ বললেন, কোথা থেকে যে হঠাৎ মেয়েটি এসে পড়ল তা ওর মুখ থেকে এখনও জানা যায়নি। তবে নিজের জীবনের কিছু কথা আমার মেয়ের কাছে বলেছে।

রাজপুরুষটি বললেন, যেখান থেকেই আসুক, আপনার ঐ বিশেষ কাজে একজন উপযুক্ত সাহায্যকারিণী পেয়ে গেলেন।

মেহেরুল্লাহসাহেব গঙ্গা-তীরের একটি বিশেষ জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, পাঁচ বছর আগে এক সকালে ঐখানে ও বসেছিল কাদায় মাখামাখি হয়ে।

বিস্ময়ের ঘোর লাগল আগন্তুকের চোখে। তিনি বললেন, পাঁচ বছর আগে?

হাঁ পাঁচ বছরই হবে। একেবারে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় মেয়েটি বসেছিল কাদা মেখে।

উত্তেজিত হয়ে বললেন আগন্তুক, ওর নাম কি রেশমী ?

আশ্চর্য ! আপনি ওকে চেনেন নাকি ? রেশমীই ওর নাম।

রাজপুরুষকে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হল।

চলুন দেখি, মেয়েটি কেমন আছে।

ওরা দুজনে আবার ঘরের উঠোনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ততক্ষণে রেশমীকে ভেতরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আমিনা ওঁদের পায়ের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

মেহেরুল্লাহ উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছে মা রেশমী ?

ভাল আছে বাবা, ও উঠে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল।

আগন্তুক রাজপুরুষটি আমিনাকে লক্ষ্য করে বললেন, রেশমীকে বলতো মা, তার বাবাসাহেব এসেছে।

আমিনা কোন কথা না বলে অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

মেহেরুল্লাহকে মসজিদের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুলতান শুজার সেনাপতি ইসলাম খান রেশমীর জীবনের সমস্ত ঘটনা বলে গেলেন। একথাও বললেন, সুলতান শুজা এখনও বিশ্বাস করেন রেশমী বেঁচে আছে।

আমিনা আর রেশমী মসজিদের কাছেই এগিয়ে এল। ইতিমধ্যে রেশমীর মুখ থেকে আমিনারও অনেক কথাই জানা হয়ে গেছে।

রেশমী আর আমিনা দুজনেই এগিয়ে গিয়ে সালাম জানাল ইসলাম খান আর মেহেরুল্লাহসাহেবকে।

ইসলাম খান খোদার কাছে দোয়া মাগলেন।

মেহেরুল্লাহ বললেন, মা আমিনা, চল আমরা ভেতরে যাই। আমাদের মেহমানকে আজ ছেড়ে দেব না। খানাপিনার আয়োজন করতে হবে।

ইসলাম খান হেসে বললেন, আমিও আজ মা আমিনার হাতের খাবার না খেয়ে নড়ছি না।

মেহেরুল্লাহসাহেব দুজনকে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সরে গেলেন কন্যা আমিনাকে নিয়ে।

হারানো মেয়ে তার বাবাকে ফিরে পেলে দুজনের ভেতর যে আবেগের স্রোত বয়ে যায়, কতক্ষণ সেই স্রোত বইল দুজনের ভেতর। রেশমী তার আব্বাজানের বুকে মাথা ঠেকিয়ে কত কাঁদল। ইসলাম খাঁসাহেব রেশমীর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

শেষে বললেন, বেটী, শুজা তোকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন, চল, তাঁর কাছে তোকে নিয়ে যাই।

রেশমী বলল, অসম্ভব! এই বিকৃত চেহারা দেখে উনি আমাকে ভুলেও রেশমী বলে স্বীকার করবেন না।

তুই আমাকে স্পষ্ট করে বল মা, শুজাকে তুই এখনও পেয়ার করিস?

রেশমী কোন উত্তর না দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

বুঝেছি। আচ্ছা, শুজা তোকে নাই চিনুন, তুই তবুও কি তাঁর কাছাকাছি থাকতে চাস? ধর্, তুই তাঁকে রোজ দেখতে পাচ্ছিস, খবরাখবর পাচ্ছিস, অথচ তিনি তোকে চেনার চেষ্টা করছেন না।

রেশমী মুখ তুলে বলল, আব্বাজান, সে কি করে সম্ভব? আমি পরিচয় না দিয়ে কি ভাবেই বা সুলতান শুজার মহলে ঢুকতে পারি? আর আগেই তো বলেছি, পরিচয় দিয়ে সুলতান শুজার মুখোমুখি হবার সাহস আমার নেই। তিনি আমার ঝলসে যাওয়া মুখখানা দেখলে ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নেবেন। এ আমি সইতে পারব না।

ইসলাম খান বললেন, তবে শোন, হঠাৎ আমার মাথায় একটা ভাবনা এসেছে, তুই রাজি থাকলে প্রাসাদে থাকার সমস্ত ব্যবস্থাই হয়ে যাবে তোর।

কি রকম? নোকরানী হয়ে? যেখানে প্রধান কাঞ্চনীর মর্যাদা নিয়ে ছিলাম আমি সেখানে নোকরানীর পদে বহাল হলে আব্বাজানের মর্যাদায় লাগবে না?

এ রকম ভাবছিস কেন বেটী। আগে তো শুনবি আমি কি বলতে চাইছি।

রেশমী তার বাবাসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সুলতান শুজার মেয়েটাকে তুই দেখে আসিস নি। এখন পাঁচ বছরে পড়েছে। একেবারে আনারকলিটি। তাকে সব সময় আগলে রাখবে, সহবত শেখাবে, এমন একটি খানদানী ঘরের দরদী মেয়ে চাই। সুলতান আর বেগমসাহেবা আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন।

রেশমী সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনি ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আমি এখনি রাজি আছি। শাহজাদার মেয়ে আমার হাতে গড়ে উঠবে, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

খানসাহেব বললেন, তোর নতুন একটা নামকরণ করতে হবে মা। এই ধর, আফ্‌রোজ বেগম।

রেশমী বলল, আমি যতটুকু জানি, তাতে আফ্‌রোজের অর্থ, 'আলোর মত সুন্দর'। আমি তো তা নই বাবা।

খানসাহেব বললেন, বাইরে যদি আলোর জ্যোতি কমেও আসে, হাজার চিরাগ জ্বলছে আমার বেটীর দিলটার ভেতর।

রেশমী হেসে বলল, সব বাবাই তার মেয়েকে আলো দিয়ে গড়া ফুলের মত মনে করে।

দূর পাগ্‌লী, আমি বুঝে সুঝেই তোর ঐ নামটা রাখলাম।

আব্বাজান, সুলতান শুজা মেয়ের কি নাম রেখেছেন?

গুলরুখ বানু।

রেশমী হৈ হৈ করে উঠল, খাসা নাম।

ইসলাম খান বললেন, তোকে আমি আমার বোনের মেয়ে বলে পরিচয় দেব। ছোটবেলা গরম জল পড়ে বাঁ দিকটা তোর পুড়ে কুঁচকে গিয়েছিল, এমনি একটা রটনা করে দিলেই চলবে।

রেশমী বলল, বেশ, এখন বল আমার আম্মাজান কেমন আছে?

তোকে হারিয়ে সে কেঁদেকেটে প্রায় অন্ধ হতে বসেছিল। বড় মায়ার শরীর রে তোর আম্মার। এখন বয়েস হয়েছে, রোগে শোকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

আমি রাজমহলের প্রাসাদে ঢোকার আগে আম্মাজানের কাছে কটা দিন কাটিয়ে যেতে চাই বাবাসাহেব।

তাই হবে বেটী, যেমন ইচ্ছে তোর।

মেহেরুল্লাহসাহেবের আস্তানা ছেড়ে চলে যাবার সময় আমিনাকে রেশমী শুজার উপহার দেওয়া দামী মুক্তোর মালাটি দিয়ে বলল, এটি আমার স্মৃতি হয়ে থাক তোমার কাছে। গলায় যখন দোলাবে তখন আমার ভালবাসার ছোঁয়াটুকু অনুভব করবে।

আমিনার চোখে জল। সে রেশমীকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকেও আমি কিছু দিতে চাই বোন। আমি গরীব, সোনা-দানা দিয়ে যে সাজিয়ে দিতে পারব সে ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমার সংসারের সবই জান, বল কি দেব তোমাকে?

রেশমী একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, তুমি যদি একান্তই কিছু দিতে চাও তাহলে তোমার কবুতরখানা থেকে কটি পারাবত আমাকে দাও। আমি খাঁচায় ভরে নিয়ে যাব। মন যখন কাঁদবে তোমাদের খবর জানার জন্যে তখন ঐ পারাবতই পত্রবাহকের কাজ করবে।

আমিনা আর মেহেরুল্লাহসাহেব সানন্দে কটি মূল্যবান পায়রা খাঁচায় ভরে রেশমীকে উপহার দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

অপরাহ্ন বেলা। সূর্যের তেজ মন্দীভূত হয়ে এসেছে। দুই অশ্বারোহী যুবা পুরুষ একটি পার্বত্য নদীর কাছাকাছি এসে পেঁাছলেন।

একজন না থেমে তাঁর অশ্বটি নিয়ে নেমে গেলেন স্রোতের মুখে। এদিক ওদিক এলোমেলোভাবে ঘোড়াটি চালিয়ে যখন ওপারে উঠলেন তখন দেখা গেল তাঁর পোশাকের নিম্নাংশ একেবারে সিক্ত।

অন্যজন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছিলেন। তিনি স্রোতের গতি লক্ষ্য করলেন। প্রথম অশ্বারোহীর ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করলেন

মনে মনে। তারপর সন্তর্পণে কিন্তু গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে অশ্বটিকে চালিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে ওপারে গিয়ে উঠলেন।

প্রথমজন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞেস করলেন, নদী পার হতে গিয়ে তুমি এতো হিসেব কষছিলে আওরঙ্গজেব? স্রোতের মুখে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়াই তো ধর্ম। জীবন তরঙ্গে ঘটনার আবর্তে মুহূর্তে লাফ দিয়ে না পড়লে জয়লাভ করবে কি করে?

মধ্যম ভ্রাতা শুজার দিকে তাকিয়ে অনুজ আওরঙ্গজেব হাসলেন মাত্র, কিছু মন্তব্য করলেন না।

আবার চলা শুরু হল।

শুজা বললেন, আওরঙ্গজেব, পরিস্থিতি কি রকম বুঝছ?

অনুকূল নয়।

বাদশার বিবেচনাটা দেখেছ? যেখানে বিপর্যয় সেখানে তোমাকে আমাকে পাঠানো হবে। কেন, দারাকে পাঠানো যেত না কান্দাহারে, কাবুলে? দিল্লীর মসনদ ছুঁয়ে থাকাই কি তার একমাত্র কাজ?

আওরঙ্গজেব বললেন, হয়তো অন্য আরও কেউ রয়েছে যার ইঙ্গিতে চলছে এইসব ক্রিয়াকর্ম।

তুমি জাহানারার কথা বলতে চাইছ তো?

ঘোড়ার রাশটা একটু টেনে ধরে মাথাটি কাত করে মৃদু হেসে আওরঙ্গজেব বললেন, আমার অনুমানের চেয়েও অনেক বেশী বুদ্ধিধর তুমি।

শুজা অনুজের প্রশংসায় গর্ববোধ করলেন। মুখে বললেন, জাহানারা সম্রাটের আশীর্বাদ কুড়োচ্ছে দারার জন্যে, আর রোশেনারা অন্দরে থেকে সব খবর সংগ্রহ করে আনছে তোমার জন্যে। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

আওরঙ্গজেব সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালেন। দেখাদেখি শুজাও নামলেন তাঁর ঘোড়া থেকে।

সন্ধ্যা ঘনাচ্ছিল। পশ্চিমাস্য হয়ে আওরঙ্গজেব নমাজ পড়তে বসলেন। শুজাও ভায়ের পাশে বসে সন্ধ্যার নমাজে যোগ দিলেন।

নমাজ সেরে কিছু সময় ঘোড়া চালিয়ে ওঁরা এসে পেঁছিলেন রাজকীয় শিবিরে। রাতের মশাল জ্বলে উঠেছে চতুর্দিকে। কিছু পরেই দুই শাহজাদার অনুসরণকারী পদাতিক ও অশ্বারোহীরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে এসে পেঁছিল।

কাবুল থেকে ফেরার পথে দুভাই কিছু পথ একসঙ্গে চললেন, এরপর আওরঙ্গজেব চলে যাবেন দাক্ষিণাত্যে আর শুজা ফিরবেন বাংলাদেশে।

তাঁবুর ভেতর দু'ভায়ের আবার কথা শুরু হল।

আওরঙ্গজেব বললেন, তুমি রোশেনারার কথা বলছিলে না? ও আমাদের সকলের থেকে ছোট, বলতে গেলে মাকে ও দেখেনি! হ্যাঁ, ওকে আমি খুবই ভালবাসি। তাছাড়া অন্দর মহলের কিছু কথা ও আমাকে সুযোগ পেলেই বলে। ওতে কিন্তু বিশেষ কিছু এসে যায় না। সম্রাট জাহানারার কথাই একমাত্র কানে তোলেন; বলতে পার ইদানীং তার পরামর্শতেই রাজ্য চলে।

শুজা মন্তব্য করলেন, তাহলে দারাই পরবর্তী সম্রাট, কি বল?

ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আওরঙ্গজেব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংযত করে নিলেন নিজেকে। উত্তেজিত হয়ে কথা বলা অথবা নিজের মনের গোপন ভাবকে প্রকাশ করা আওরঙ্গজেবের স্বভাবধর্ম নয়।

তিনি বললেন, তোমরা যে কেউ সিংহাসনে বসলে আমি অনুরক্ত ভায়ের মত তোমাদের সমর্থন করে যাব, কিন্তু প্রাণ গেলেও দারাকে নয়। অল্প বয়সের স্মৃতিটা নিশ্চয়ই মুছে যায়নি তোমার মন থেকে।

দুজনেই মুহূর্তে ডুব দিলেন স্মৃতির গভীরে।

আওরঙ্গজেব তখন চোদ্দ বছরের অতি সুদর্শন এক কিশোর। শুজা তরতাজা তরুণ। দারা ছুঁয়েছে দুরন্ত যৌবনের সীমা। তিন ভাই অতি প্রত্যুষে অশ্বারোহণে বেড়াচ্ছিল যমুনার তীরে। উন্মুক্ত প্রান্তর, সামনেই প্রাসাদ।

আজ হাতির লড়াইয়ের দিন। যমুনা তীরে বহু মানুষের জমায়েৎ হয়েছে লড়াই দেখার জন্য। সম্রাট এসে বসলেন তাঁর ঝুল বারান্দার নির্দিষ্ট আসনটিতে।

দুটি হাতি শুঁড় তুলে সেলাম জানাল সম্রাটকে। তারপর দুই

মাহুতের নির্দেশে মুখোমুখি হল দুজনে। এবার লড়াই হবে। একদিকে 'সুধাকর' অন্যদিকে 'সুরত সুন্দর'।

মাহুতরা আবার নির্দেশ দিল। অমনি পেছু হটতে লাগল দুজনে। মাহুতরা নীচে দাঁড়িয়েই উত্তেজিত করছিল দুটি হাতিকে। এবার তারা হাতি দুটি ছেড়ে দিল।

সুধাকর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর রকমের। সে এগোবার জন্যে পা তুলল।

ঘোড়ায় চড়ে নির্ভীক কিশোর আওরঙ্গজেব ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। লড়াইটা একেবারে কাছ থেকে দেখবে, এই ইচ্ছে।

সুধাকর ক্ষিপ্ত হয়ে এগোচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল আওরঙ্গজেবের ওপর। অমনি পরিবর্তিত হয়ে গেল তার দিক। একটা ধূম্রবর্ণের পাহাড় যেন গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসতে লাগল শাহজাদার দিকে।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে দেখে হৈ হৈ করে উঠল জনতা। তারা ভয়ে দৌড়তে লাগল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। হুড়োহুড়ি করে পালাতে গিয়ে কত মানুষই না পড়তে লাগল এ ওর ঘাড়ে।

বাজি ফাটাতে লাগল ভৃত্যেরা, যাতে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় হাতিটা। কিন্তু গোঁ চেপে গেছে তখন সুধাকরের, এতটুকু বাচ্চার আস্পর্ধা তো কম নয়!

সত্যিই কিশোরটি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালাল না। হাতিটি তেড়ে আসা মাত্রই সে তার হাতের বল্লমটি হাতির কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

হাতি গেল আরও ক্ষেপে। সে শুঁড় তুলে আঘাত করল ঘোড়াকে। ঘোড়া সমেত আরোহী পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আওরঙ্গজেব। কোমরে ঝোলান তরবারিটি কোষ থেকে টেনে বার করে এগিয়ে গেল হাতিটাকে আঘাত করতে।

শাজাহান তাঁর দেহরক্ষীদের চিৎকার করে বলতে লাগলেন, বাঁচাও, ছেলেটাকে বাঁচাও।

ভীড় আর বাজীর ধোঁয়া ঠেলে সেই মুহূর্তে ভায়ের কাছে এগিয়ে এল শাহজাদা শুজা। সেও বিপুল বেগে ছুঁড়ল তার হাতের বল্লম। আহত হল হাতিটা। কিন্তু শুজার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল ভয় পেয়ে। শাহজাদা শুজা পড়ে গেল মাটিতে। রাজা জয়সিংহও ছুটে এলেন ঢাল তলোয়ার উঁচিয়ে।

এই সময় আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটল। পটকা বাজির আওয়াজে গজরাজ সুরতসুন্দর বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মগজে লড়াইয়ের বাসনা জেগে উঠল। সে দৌড়তে দৌড়তে তেড়ে আসতে লাগল প্রতিপক্ষ সুধাকরের দিকে!

এবার টনক নড়ল সুধাকরের। বাজির শব্দ, প্রতিপক্ষের আক্রমণ, প্রতিদ্বন্দ্বীর আস্ফালন সহসা তার মনে ভয়ের সঞ্চার করল। সে রণভূমি ত্যাগ করে পালাতে লাগল দ্রুত গতিতে।

সম্রাট শাজাহান ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন। তিনি জড়িয়ে ধরেছেন বীরপুত্র আওরঙ্গজেবকে।

তিনদিন পরেই পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করল শাহজাদা আওরঙ্গজেব। সম্রাট সমস্ত সভাসদদের উপস্থিতিতে পুত্রকে তুলা দণ্ডে তুলে সুবর্ণ মুদ্রায় ওজনের নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে আরও বহু উপহার সহ ঐ সুধাকর হাতিটিকেও দিয়ে দিলেন।

কবি চূড়ামণি বেদিল খান উর্দু আর ফারসীতে রচনা করলেন আওরঙ্গজেবের বীরগাথা।

তিনি পেলেন পঞ্চসহস্র মুদ্রা পুরস্কার।

শাহজাদা শুজাকেও তার অসম সাহসিকতার জন্য বিপুলভাবে সাধুবাদ জানান হল।

সম্রাট শাজাহান বীরপুত্র আওরঙ্গজেবের কীর্তিতে এমনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাকে পরবর্তী বছরে কাশ্মীরে নিয়ে গেলেন ভ্রমণ-সঙ্গী করে। সেখানে গিয়ে সহিদাবাদের কাছে একটি পরগণাও দান করলেন পরম আনন্দে।

স্মৃতির জগৎ থেকে দু'ভাই-ই ফিরে এলেন বাস্তবে।

আওরঙ্গজেব বললেন, সেদিন দূরে ঘোড়ার ওপর বসে দারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিল, কখন আসে আমার শেষ লগ্নটি। সে একবারের জন্যও এগিয়ে এল না, এমনকি মুখে উচ্চারণ করল না

একটিও শব্দ। কিন্তু তার জন্য আমি একটুও আশ্চর্য হইনি; আশ্চর্য হয়েছি পিতার ব্যবহারে।

নিজের পেটিকা থেকে একখণ্ড পত্র বের করে আহত আওরঙ্গজেব তুলে দিলেন শাহজাদা শুজার হাতে।

কি এটি?

আওরঙ্গজেব বললেন, পড়ে দেখ। তুমি পিতার সঙ্গে ছিলে কাবুলে, আমি কান্দাহারে নিদ্রাহীন নিশি যাপন করেছি দুর্গ অধিকারের কথা ভেবে। ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না, তাই সম্ভব হয় নি দুর্গ অধিকার। কামান আর গোলন্দাজ দুই-ই ছিল নিম্ন মানের। পিতা আমার ওপর ভরসা না রেখে সেনাধ্যক্ষ সাদুল্লাহ খানের কাছে নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠাতেন। তিনি কাবুলে বসেই পরিচালনা করতেন যুদ্ধ। সাদুল্লাহ খানের আগ্রহ ছিল না আমার সঙ্গে কোন রকম পরামর্শে বসার।

কিন্তু যখন দুর্ভাগ্যবশত দুর্গ জয় সম্ভব হল না তখন সমস্ত অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল আমার মাথায়।

আমি যখন করুণভাবে সম্রাটের কাছে আরও কিছু সময় প্রার্থনা করলাম, তখন তিনি যুদ্ধ বিরতির ফরমান জারি করে বসে রইলেন। ঠিক তারপরেই আমার আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে লিখলেন ঐ চিঠিখানা। কেবল শেষ অংশটুকু পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

শুজা সবটুকু পড়লেন। শেষ অংশে লেখা ছিল, 'কান্দাহার জয়ের শক্তি তোমার আছে এ বিশ্বাস যদি আমার থাকত তাহলে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে চলে আসতে বলতাম না। প্রতিটি মানুষ কিছু না কিছু কাজ করতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, অভিজ্ঞ মানুষের কোনরকম উপদেশের দরকার হয় না।'

পড়া শেষ হলে শুজা আওরঙ্গজেবের মুখের দিকে তাকালেন।

আওরঙ্গজেব বললেন, পড়লে তো?

মাথা নাড়লেন শুজা।

আমিও একটিমাত্র ছত্রে ওঁর চিঠির জবাব দিয়েছি।

শুজা কৌতূহলী হলেন, কি লিখলে?

লিখলাম, 'সামান্যতম জ্ঞান যার আছে সে তার ক্ষতি থেকে নিজের মঙ্গলটুকু বুঝে নিতে পারে।'

শুজা ভাইকে সাধুবাদ দিলেন। খানিকসময় চুপ করে থেকে বললেন, আগে সম্রাটের চরিত্র কিন্তু এরকম ছিল না, দারাই বিষাক্ত করে তুলেছে মানুষটাকে। আমি স্বাস্থ্যের কারণে বিহারের কয়েকটি গ্রাম বায়ু পরিবর্তনের জন্য চেয়েছিলাম। চিঠি এল সম্রাটের কাছ থেকে। অনেক কথাই লিখেছেন, কেবল আমার প্রার্থিত গ্রামগুলি সম্পর্কে নীরব।

দারার সম্ভবত এই ধারণা হয়েছিল যে আমি ক্রমে ক্রমে দিল্লীর দিকে এগোবার চেষ্টা করছি।

সেই রাতেই একটি অলিখিত চুক্তি হল দুভায়ের ভেতর। দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের ওপর চুক্তি।

প্রস্তাবটা এলো আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে।

তোমার কন্যা গুলরুখের বয়স এখন কত হল?

শুজা বললেন, বার বছরে পড়ল। বেটী বয়সের তুলনায় একটু বেশী রকমের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে।

আওরঙ্গজেব আবার বললেন, 'তুমি আমার বড় ছেলে সুলতান মুহাম্মদকে কতদিন দেখনি?

বছর পাঁচেক আগে সেই যে সম্রাটের ডাকে দিল্লীতে ভায়েরা সব একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম, তখনই ওকে দেখেছি।

এখন ও চৌদ্দতে পড়ল।

শুজা বললেন, ভায়েদের ভেতর তুমি সব থেকে সুদর্শন আওরঙ্গজেব। সুলতান মুহাম্মদও তোমার মতই সুন্দর।

আওরঙ্গজেব বললেন, আমি একটা প্রস্তাব রাখি তাহলে?

প্রস্তাবের আগেই আমি আমার সম্মতি জানিয়ে রাখছি।

দুজনেই এবার প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন।

শুজা বললেন, আর বছর তিনেক অপেক্ষা করলে কেমন হয়?

রাজি।

তবে এসো হাতে হাত রেখে দুভাই ব্যবস্থাটা পাকা করেনি।

আওরঙ্গজেব হাত বাড়িয়ে দিলেন। শুজা ভায়ের হাতটি মুঠো করে ধরলেন।

আওরঙ্গজেব বললেন, ব্যাপারটা এখন তাহলে গোপন থাক, কি বল?

অবশ্যই। না হলে দারা এখন থেকেই ভাবতে শুরু করবে, আমরা দুজনে ওর বিরুদ্ধে হাতে হাত মিলিয়েছি।

আওরঙ্গজেব মন্তব্য করলেন, বেচারা কটা দিন শান্তিতে থাকুক। সুখস্বপ্ন দেখুক।

কিন্তু ভাই আমাদের বন্ধন অটুট রইল আজ থেকে। দারার বিরুদ্ধে আমরা দুভাই এক হলাম।

আওরঙ্গজেব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, অবশ্যই।

শুজা এবার বললেন, মুহাম্মদ একবার আমার রাজমহলে বেড়িয়ে আসুক। গুলবুখকে ভাল করে দেখুক ও।

আমার আপত্তি নেই, তবে বিয়ের কথাটা গোপন রাখাই ভাল। চাচার ওখানে বেড়াতে যাচ্ছে, শিকার করবে, গঙ্গার বুকে নৌকো-বিহার করবে। মনমেজাজ ভাল হয়ে যাবে। এরপব তো আর বেশী সময় পাবে না, ঢুকে পড়তে হবে সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজে।

॥ ছয় ॥

গুলরুখ বানুর সঙ্গে সুলতান মুহাম্মদের দেখা হয়েছিল দুবার মাত্র। প্রথমবার রাজমহলে। দাক্ষিণাত্য থেকে অতি বিশ্বস্ত একজন পথ-প্রদর্শক ও চারজন সুদক্ষ দেহরক্ষী আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ওড়িষ্যার ভেতর দিয়ে মুহাম্মদকে নিয়ে গিয়েছিল রাজমহলে।

দ্বিতীয়বারে নিজেই অন্তরের দুর্নিবার আকর্ষণে নিশীথের সংক্ষুব্ধ নদী পার হয়ে তন্দায় মিলিত হয়েছিল মানস সুন্দরীর সঙ্গে।

প্রথম দর্শনে রাজমহলে দুটি অপরিণত কিশোর কিশোরী আধফোটা গোলাপের মত জেগে উঠেছিল। দক্ষিণের ভারী মিঠে

বাতাস বইছিল তখন! আম্র মুকুলের রসাস্বাদনে উন্মুখ একটা কোকিল নিজেকে ঘন পাতার আড়ালে গোপন রেখে বার বার ডেকে উঠছিল।

একটা হলুদ প্রজাপতি সম্ভবত ব্যস্ত ছিল দূতিয়ালির কাজে। সে কখনো এ কুঁড়ি, কখনও বা ও কুঁড়িটির কাছে গিয়ে চুপি চুপি কি কথা বলছিল কানে কানে কে জানে! কথার ফাঁকে ফাঁকে দুলে দুলে উঠছিল কুঁড়ি দুটি। অনুরাগেব সংলাপে না মিঠে সুরের ছোঁয়ায়?

সূর্যের সোনায়, আকাশের নীলে, বনের সবুজে সে কি মাতামাতি। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, অশোক, গুলমোহর বইয়ে দিল রঙের বন্যা।

রাজমহলে শুজার উদ্যানে বসে বাঁশিতে সুর তুললেন ঋতুরাজ বসন্ত।

মুকুলিত আম্রকুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তিনটি প্রাণী। চতুর্দশ বর্ষের মনোহর কিশোর সুলতান মুহাম্মদ চেষ্টা করছিল সেই পাখিটাকে খুঁজে বের করতে যার মিঠে সুরের ডাক মাৎ করে দিচ্ছিল চরাচর। অন্যদিকে বোরখা ঢাকা আফরোজের একখানা হাত চেপে ধরে সকৌতুকে তার চচেরা ভাইয়ের কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করছিল গুলরুখ।

এক সময় পাখির হদিস পেয়ে গেল মুহাম্মদ। অমনি বাঁ হাতের তর্জনী ঠোঁটের ওপর ঠেকিয়ে উত্তেজিত ভাবে ডান হাতখানা নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল গুলরুখকে।

ভাবখানা এই, জলদি এসো, কিন্তু কথাটি বল না।

অমনি মাথাটা নীচু করে একটা খরগোশের মত চমকে থমকে দ্রুত পা ফেলে ফেলে মুহাম্মদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল গুলরুখ।

শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের মত মুখখানা পল্লবভরা আম্রশাখার দিকে তুলে ধরল সে। কালো ভ্রমরের মত দুটো চোখের তারা উড়িয়েও সে হদিস পাচ্ছিল না পাখিটার।

উত্তেজিত মুহাম্মদের হাতের ছোঁয়া লাগল গুলরুখের মাথার একরাশ চুলে। সে পাখিটার নির্ভুল অবস্থান জানাতে চাইল গুলরুখকে।

চমকে উঠল গুলরুখ। আব্বাজান ছাড়া কোন পুরুষের হাতের ছোঁয়া সে পায়নি এতদিন। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ কদম ফুলের কেশরের মত শিউরে উঠল তার সারা শরীরে। তবু সে নিজেকে সংযত করে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। পাখি দেখার আগ্রহ কেন জানিনা লুপ্ত হয়ে গেল তার।

আত্মগোপনকারী কোকিলটা বার দুয়েক পঞ্চমে কুহু কুহু তান ধরেই উড়ে গেল অন্য কোন অন্তরালে।

সুলতান মুহাম্মদকে এক ধরনের খেলায় পেয়ে বসেছিল। সে কোকিলটার অনুসরণ করে ঢুকে গেল তরুলতাগুল্মের গভীরে।

পেছন থেকে এগিয়ে এল আফরোজ। সে চেয়ে দেখল তার অনেক আদরের গোলাপটির চোখের পাপড়িতে ভোরের শিশির টলমল করছে।

মুখখানা তুলে ধরতেই ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা শিশির বিন্দু।

কি হল তোমার সোনা?

কই কিছু না তো।

তবে এমন ডাগর দুটো চোখ থেকে জল গড়াল কেন মানিক? কেউ কিছু বলেছে?

কে আবার কি বলবে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, জল এল কোথা থেকে।

আফরোজ গুলরুখকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে আদর করল। মুখে বলল, দাদা কিছু বলেছে তোমাকে?

দাদা আমাকে পাখি দেখাচ্ছিল, কিন্তু আমি পাখিটাকে দেখতে পাইনি। হঠাৎ পাখিটা কুহু কুহু করে ডেকে উঠল। আমার বুকের ভেতর কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। দাদা বোধহয় ছুটে গেল উড়ে যাওয়া পাখিটার খোঁজে, আর আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম এখানে।

গুলরুখ, মানিক আমার, তাই তোমার চোখে জল!

বলেছি তো, চোখে কেন জল এল তা আমি জানি না।

ছোট্ট তলোয়ারটি ঝুলছে কোমর থেকে। হাতে ধরা আছে মুকুটের মত মাখন রঙের একটি আমের মঞ্জরী। মুখে মৃদু হাসি, চোখে আমন্ত্রণ।

ভাষা নেই মুখে, তবু কত কথা বলা হয়ে গেল: এসো আমার কাছে, তোমার মাথায় পরিয়ে দেব আম্রমঞ্জরীর মুকুট।

খুশীর হিল্লোল উঠল গুলরুখের বুকের মধ্যে। সে হাসির কুন্দ ফুল ছড়াতে ছড়াতে ছুটে গেল সুলতান মুহাম্মদের দিকে। হাত থেকে তার কেড়ে নিল প্রকৃতির নিজের কর্মশালায় গড়া অতি সুশোভন মুকুটটি।

অধিকারের গলায় বলল, এটা আমার।

মুহাম্মদ বলল, আমি তো তোমার জন্যেই এনেছি। দাও আমার হাতে, তোমার মাথায় পরিয়ে দেখি, কেমন মানায়।

এবার জলতরঙ্গের মত হাসি বেজে উঠল গুলরুখের কণ্ঠে। সুলতান মুহাম্মদ আম্রমুকুলের মনোহারী মুকুটটি পরিয়ে দিল গুলরুখের মাথায়।

লতাবিতানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আফরোজ। সে ওদের সব কথাই শুনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় জেগেছিল একটা পরিকল্পনা। সে হাতের কাছে নুয়ে পড়া কৃষ্ণচূড়ার একটা ফুলে ভরা ডাল ভেঙে এনেছিল। এটিও অপূর্ব এক মুকুট। লাল হলুদ ফুল থরে থরে সাজানো, তার ওপর সবুজ কুঁড়িগুলো মুকুটের আকারে উঠে গেছে ওপরের দিকে।

ফুলেভরা ডালটা তুলে ধরে বলল আফরোজ, এটা তুমি পরাবে তোমার দাদাকে।

গুলরুখ রঙীন ফুলের মুকুটটা পরিয়ে দিল সুলতান মুহাম্মদের মাথায়। এবার নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সেটা। শেষে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, চমৎকার! বাদশার মুকুটের চেয়েও সুন্দর।

আফরোজ বলে উঠল, সত্যিই সুন্দর।

গুলরুখ বলল, বল না, কারটা বেশী সুন্দর?

দুজনের ভেতর যে বেশী সুন্দর, তার মুকুটখানাই বেশী সুন্দর।

সঙ্গে সঙ্গে সুলতান মুহাম্মদ বলে উঠল, গুলরুখই বেশী সুন্দর।

কান্নার গলায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গুলরুখ বলল, আশিতে

নিজেকে ভাল করে দেখনি তো কখনো, তাহলে এমন কথা বলতে না।

আফরোজ বেগমসাহেবার মুখে শুনেছিল এই দুটি কিশোর-কিশোরীর ভবিষ্যৎ মিলনের খবর। তার মনে হল, আশমানের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায়। পৃথিবীতে এমন কে আছে বিচারক যে বলে দেবে দুটির ভেতর কোনটি বেশী সুন্দর।

রোজ গঙ্গাতীরে বেড়িয়ে বেড়ায় তিনজনে। কোনদিন সুলতান মুহাম্মদ ঘোড়সওয়ার। ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য বস্তুর দিকে ছুঁড়ে মারে বল্লম। কি নিপুণ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা তার। অবাক বিস্ময়ে দেখে গুলরুখ আর আফরোজ।

আবার কোনদিন তলোয়ারের খেলা দেখায়। বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরতে থাকে তলোয়ার। হঠাৎ বুক কাঁপানো চিৎকার তুলে শত্রুর বুকে গেঁথে দেয় সেই তীক্ষ্ণধার অসি। তলোয়ার যখন ঘোরায় তখন সূর্যালোকে ঝলসাতে থাকে। অদৃশ্য হয়ে যায় অসির আকার। কেবল মনে হয় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন।

মস্তবড় তীরন্দাজ ঐ চোদ্দ বছরের কিশোর। ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় উড়ন্ত পাখির পেছনে। কখন হাতের তীর ছুটে যায়। আকাশের পাখি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

একদিন ভয় পেয়ে গিয়েছিল আফরোজ, সুলতান মুহাম্মদের একটি খেলা দেখে।

বিশাল আকারের একটি মহানিম গাছের তলায় দাঁড়াতে বলল গুলরুখকে। মুহাম্মদের নির্দেশে সে গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

সুলতান মুহাম্মদ তখন গুলরুখকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল তীর। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহ ঘেঁষে তীরগুলো বিদ্ধ হতে লাগল মহানিম গাছে।

আশ্চর্য। গুলরুখ সেই যে চেয়ে রইল মুহাম্মদের দিকে, খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পলকও পড়ল না, শরীরও কাঁপল না।

আফরোজ কিন্তু মরে গেল ভয়ে। প্রতিটি তীর নিক্ষেপের সঙ্গে

সঙ্গে কেঁপে উঠত তার বুক। এমনটি তো হবার কথা নয়। পর্তুগীজ রক্ত বইছে তার শরীরে। সাহসী পিতার নির্ভীক কন্যা রেশমী। তবে আফরোজ ছদ্ম নামটি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কি নিভে গেল তার সমস্ত সাহস। না, তার ভয়ের একটা কারণ খুঁজে পেল আফরোজ। পাঁচ বছরের শিশু গুলরুখের সমস্ত দায়িত্ব নির্দ্বিধায় তার ওপর তুলে দিয়েছিলেন শাহজাদা শুজা। তিনি বোরখা আর ছদ্মনামের আড়ালে তাঁর একান্ত প্রিয় নর্তকীটিকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু ইসলাম খানের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন আফরোজকে।

ইসলাম খান শাহজাদাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, কেবল সহবত শেখান কিংবা সৌন্দর্যবোধ জাগানোই এর কাজ নয়, মালিকের কন্যাটিকে নিজের প্রাণের বিনিময়েও রক্ষা করার দায়িত্ব এ নিজের ওপর তুলে নিতে পারে।

শাহজাদা শুজা সেদিন নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে তুলে দিয়েছিলেন গুলরুখের ভার আফরোজের ওপর।

তাই ভয়। এ কিশোরের তীরে যদি বিদ্ধ হত গুলরুখ তাহলে শাহজাদা শুজার কাছে কি কৈফিয়ত দিত আফরোজ? বাবাসাহেব ইসলাম খানের ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে যেত না?

এখন ভয়ের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বিস্ময়। কি করে পারল এই কিশোর, এমন একটি অসাধ্য সাধন করতে! হ্যাঁ, মোগল সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার বহন করতে হলে এমনি অব্যর্থ লক্ষ্যবিদ ও আত্মবিশ্বাসীর প্রয়োজন।

কিন্তু আফরোজকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিল একজন। সে গুলরুখ।

সুলতান মুহাম্মদের ওপর এতখানি বিশ্বাস সে পেল কোথায়! এমন দ্বিধাহীন, ভয়হীন নির্ভরতা।

খেলা শেষে তীরগুলো একে একে তূণীরে ভরে তুলল মুহাম্মদ। তারপর অকুতোভয় দ্বাদশী কন্যাটির হাত ধরে নিশ্চিন্তে, পরমানন্দে অগ্রসর হল সে।

অন্য একদিন আফরোজ শুরু করে দিল তার পারাবতের খেলা।

দূর পাহাড়ের ধারে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল সুলতান মুহাম্মদ। সঙ্গে আফরোজের দেওয়া একটি শিক্ষিত পারাবত। রাজমহলের পাহাড়তলীতে বসে সুলতান মুহাম্মদ পত্র রচনা করে ঐ পারাবতের পাখায় বেঁধে পাঠাবে গুলরুখের কাছে। আবার গুলরুখও ঐ পারাবতের মাধ্যমে পাঠাবে তার উত্তর যথাস্থানে।

এসব ক্ষেত্রে দুটি পারাবত থাকে। একটি কপোত অন্যটি কপোতি। কপোত কপোতির প্রেমাকর্ষণ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যে সব পারাবতকে দিয়ে এইসব পত্র আদানপ্রদানের কাজ করানো হয়, তাদের শিক্ষা দিতে হয় প্রথমাবস্থা থেকে। কপোত কপোতি দুটিকে রাখতে হয় শৈশবকাল থেকে একই বাসায়। খাবার দাবার চলাফেরা, সব একই সঙ্গে। বড় হলে এই জোড়াটির ভেতর জন্মায় গভীর অনুরাগ। একজনের বিচ্ছেদ-বিরহে অস্থির হয়ে ওঠে অন্যজন। এই সুযোগটি গ্রহণ করে একজনকে পাঠিয়ে দিতে হয় দূরে। সেখানে ওর পালকে পত্রটি এঁটে দিলে ও ঊর্ধ্ব-শ্বাসে উড়ে আসবে ওর বিরহিনী প্রিয়ার কাছে। পক্ষীতত্ত্ববিদ মাত্রেরই এ সকল তথ্য জানা আছে।

দারুণ রকমের একটা উত্তেজনার ভেতর পড়ে গেল সুলতান মুহাম্মদ। সে ছোট্ট দু'তিনটি পালকের আকারে কাগজ নিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে লেখনী।

সে তার প্রথম পত্রটি লিখল গুলরুখকে :

দূর, দূরে থাকে না
যদি ভাল লাগার স্মৃতি দিলের মধ্যে থাকে।
মেঘ ঋতু মানে না
যদি মনের ময়ূর পেখম মেলে ধরে।

ছোট্ট পত্রটি লেখা শেষ করে পারাবতের পাখায় এঁটে উড়িয়ে দিল সেটিকে। প্রিয়া বিরহে কাতর পারাবতটি উড়ে এল প্রাসাদ শিখরে। আফরোজ তাকে ধরে নিল।

সুলতান মুহাম্মদের চিঠি আগে কে পড়বে তাই নিয়ে কাড়া-কাড়ি পড়ে গেল আফরোজ আর গুলরুখের ভেতর। শেষে ইচ্ছে করেই হার মেনে নিল আফরোজ।

এবার গুলরুখ আফরোজের হাতে চিঠিখানা তুলে দিয়ে বলল,

তুমি পড় মৌলবীজী, আমি চোখ বুজে শুনে যাই।

গুলরুখ মাঝে মাঝে মজা করে আফরোজকে মৌলবীজী বলে ডাকত।

মরে যাই, তোমার প্রিয় মানুষটি তোমাকে চিঠি দিয়েছে, সে চিঠি আমি পড়ব কোন দুঃখে।

গুলরুখের দিক থেকে অনুরোধ উপরোধ চলল কতক্ষণ। শেষে বাদশাজাদার নাতির লেখা চিঠি হাতে নিল আফরোজ।

চোখ বুলিয়েই অবাক। এই বয়সে কি করে ভাবনায় এমনখানি সোনালী পাক ধরাতে পারল কিশোরটি!

আগে চিঠিখানা পড়ল আফরোজ, তারপর ব্যাখ্যা করে ভাবটা বুঝিয়ে দিল গুলরুখকে।

ভারী খুশী হয়ে উঠল গুলরুখের কিশোরী মন। কিন্তু এ চিঠির একটা লাগসই জবাব দেওয়া অথবা নতুন দু'এক ছত্র লিখে পাঠানো তার সাধ্যের বাইরে। অতএব মৌলবীজীর দিকে তাকাতে হল।

মুসাবিদা হল দুজনে মিলে। ভাব দিল আফরোজ আর তাতে বাদশাহী ভাষার ছোঁয়া লাগাল গুলরুখ।

আবার পত্র নিয়ে উড়ল পারাবত। উড়ে গিয়ে নামল চিহ্নিত পাহাড়টির নীচে। সুলতান মুহাম্মদ তাকে ধরে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। পাখার তলায় আটকানো পত্রটি বের করে নিল ধীরে ধীরে।

চোখ দুটো এবার আটকে গেল পালকের আকারে একখানা ছোট্ট চিঠির পাতায়।

আমি যদি বাতাস হতাম
তাহলে বইতাম তোমার বুকের ভেতর দিয়ে।
আমি যদি নিদ্রা হতাম
তাহলে তোমাকে উপহার দিতাম কিছু স্বপ্ন।

এমনি খেলায় মেতে উঠল দুজনে। একটুতে রাগ একটুতে অনুরাগ। এ যেন শরতের মেঘ, খেলা করছে দুজনের মনের আকাশে। এখুনি নামল ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি, পরক্ষণেই রোদ্দুর উঠল ঝলমলিয়ে। মাঝে মেঘের গায়ে রামধনুর ছোঁয়া লাগাচ্ছে

আফরোজ। উড়ছে ভাললাগা আর ভালবাসার বর্ণময় ঘুড়ি।

কদিনের স্বপ্নবাসর শেষ হল গঙ্গার বুকে নৌযাত্রার ভেতর দিয়ে।

শাহজাদা শুজার আদেশে সাজান হয়েছে বাদশাহী বজরা! নিয়োগ করা হয়েছে নিপুণ মাল্লাদের। আকাশ নির্মল। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় দুধ সাগরের ঢেউ।

ফরাসের ওপর কাজকরা মখমলী তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছে সুলতান মুহাম্মদ। তার বুকে আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে গুলরুখ। একটু দূরে গঙ্গার দিকে চেয়ে আফরোজ।

কাল প্রভাতেই আসছে এক নির্বাক বিষণ্ণ বিদায় লগ্ন।

জ্যোৎস্না ধোয়া রাতের নদী বেয়ে দ্রুত দাঁড় টেনে চলে যাচ্ছে একটি নৌকো। হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাঝি। গলায় বেজে উঠেছে গান। সুর ভেসে চলেছে জলের স্রোতে, বাতাসের স্রোতে। আশ্চর্য সুরের টান, একেবারে বুকে এসে বাজে।

দূরে চরের বুকে ছোট ছোট গ্রাম। জ্যোৎস্নার আলোয় স্বপ্নময়।

নীরবতা ভাঙল সুলতান মুহাম্মদ।

জান গুলরুখ, আমাদের দাদু বাদশা শাজাহানের পিতা ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর নাম ছিল নূরজাহান।

গুলরুখ অমনি যোগ করল, 'জগতের আলো'।

হ্যাঁ তাই। সৌন্দর্যে, ব্যক্তিত্বে মোগল অন্তঃপুরে তাঁর জুড়ি ছিল না কেউ।

একটু থামল সুলতান মুহাম্মদ। গুলরুখ অমনি বলল, আজ এই মুহূর্তে তাঁদের কথা তোমার মনে পড়ল কেন?

ঠিক এমনি এক জ্যোৎস্না ভরা পূর্ণিমার রাতে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের হ্রদে আমাদেরই মত নৌ-বিহার করেছিলেন তাঁরা।

গুলরুখ বলল, কেমন সে হ্রদ?

চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সে পাহাড়ের মাথায় বরফের মুকুট। হ্রদের জল ঠিক যেন বিশাল একখানা আয়না। ঐ আয়নায় সারাদিন নিজেদের মুখ দেখে নীল পাহাড়গুলো। হ্রদের জলে

পদ্ম ফোটে। সে পদ্ম এত বড় যে হাতের অঞ্জলিতে ধরা যায় না।

গুলরুখ অধীর আগ্রহে বলল, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? আমরা ঠিক এমনি পূর্ণিমার রাতে ঐ হ্রদে সম্রাট জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের মত নৌকোয় ভেসে বেড়াব।

গুলরুখের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে সুলতান মুহাম্মদ বলল, আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হবার নয়। তিনি চাইলে তোমার জল-বিহারের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

॥ সাত ॥

দীর্ঘ পাঁচটা বছর কেটে গেল দুটি হৃদয়ের চাওয়া আর না পাওয়ার ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ ঝড় উঠল। পূর্ব পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকপ্রান্ত জুড়ে ঘনিয়ে উঠল ঝড়। সে ঝড় ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল যমুনা তীরের প্রাসাদ লক্ষ্য করে। ঝড়ের মেঘে ঘন ঘন অশনি-সংকেত।

সম্রাট শাজাহান দীর্ঘ রোগ-শয্যায় শায়িত। যে সাম্রাজ্য শাসিত হত সম্রাটের অঙ্গুলির সামান্য সঞ্চালনে, যার অধিবাসীদের উত্থান পতন, জীবন মৃত্যু নির্ভর করত সম্রাটের ইচ্ছার ওপর, তিনি আজ দুর্বল, অসহায়, প্রায় উত্থান শক্তি রহিত একটি জড় জীবের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন সেই সাম্রাজ্যের ওপর ঝটিকার তাণ্ডব।

অতি দ্রুত গতিতে প্রবল ঝড় ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। একে অঙ্গুলি হেলনে স্তব্ধ করা যায় না। এর সর্বগ্রাসী শক্তিকে বিস্ফারিত নেত্রে শুধু দেখে যেতে হয়।

সম্রাটের অসুস্থতার খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল হিন্দুস্থানের প্রতিটি প্রান্তে। দাক্ষিণাত্যের সুবেদার আওরঙ্গজেবের চোখের ওপর ভেসে উঠল ময়ূর-সিংহাসন। তিনি দেখতে লাগলেন, ওমরাহদের কুর্নিশ গ্রহণ করতে করতে তিনি এগিয়ে চলেছেন সেই সিংহাসনের দিকে।

না, কল্পনা নয়, রূঢ় বাস্তবকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে তাঁকে। অবিচলিত মানসিক শক্তি, কূট কৌশল আর নিপুণ রণনীতিই একমাত্র পারবে তাঁকে জয়ের লক্ষ্যে পেঁৗছে দিতে।

গুজরাটে মুরাদ নিজেকে ঘোষণা করলেন হিন্দুস্তানের সম্রাট বলে। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন আগ্রা অভিমুখে!

শুজা তাঁর রাজধানী রাজমহলে নবীন সম্রাট হিসেবে নিজের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। কণ্ঠে দুলিয়ে নিলেন দীর্ঘ উপাধির মালা। মসজিদে মসজিদে নবীন সম্রাটের শুভযাত্রার জন্য অনুষ্ঠিত হল প্রার্থনা। নতুন মুদ্রায় উৎকীর্ণ হল সম্রাটের সুদীর্ঘ উপাধি। এখন শুধু অবশিষ্ট রইল ময়ূর সিংহাসন অধিকারের কাজ।

অসুস্থ শাজাহান জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকেই ঘোষণা করলেন তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে।

কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে তখন একটি বাজ তার পাখা মেলে দিয়েছে আগ্রা লক্ষ্য করে। সাম্রাজ্যরূপ মহার্ঘ্য ভোজ্য বস্তুটিতে তখন তার তীক্ষ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মনের অসীম শক্তি দুটি ডানায় সঞ্চারিত। নখরে নখরে প্রার্থিত বস্তু ছিনিয়ে নেবার দৃঢ় সংকল্প।

মাঝপথে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হলেন মুরাদ। ভারত ভাগের শর্তে মিলিত হলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। সম্মিলিত বিপুল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন তাঁরা।

মদ্যপ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতাকে তুষ্ট করার জন্য আওরঙ্গজেব

একদিকে রাখলেন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, অন্যদিকে মুরাদকে ঘন ঘন হিন্দুস্তানের বাদশা বলে অভিহিত করতে লাগলেন।

শেষে আওরঙগজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর অদূরে ধর্মাটে এবং আগ্রার কিছু দূরে সামুগড়ে বিধ্বস্ত করলেন দারার বাহিনীকে। আজমীরে পলায়ন করে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করলেন দারা। শেষে দেওরাইয়ের যুদ্ধে নির্ধারিত হয়ে গেল তাঁর ভাগ্য। প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন আশ্রয়ের আশায় পারস্য অভিমুখে। কিন্তু অমোঘ ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হল তাঁকে। বোলান গিরিবর্তের সন্নিকটে তিনি হলেন বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। এরপর শাহজাদা দারা শিকোর জীবনের নিষ্ঠুরতম পরিণতির কথা ভারতভূমির কোন মানুষের কাছেই অবিদিত নয়।

আওরঙগজেবের ইঙ্গিতে বন্দী হলেন আরও দুজনে। স্বয়ং ভারতসম্রাট শাজাহান, আর তাঁর কনিষ্ঠপুত্র মুরাদ। বন্দী অবস্থায় মুরাদও নিহত হলেন নিষ্ঠুর ভাবে।

এখন প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যম ভ্রাতা।

তখন আগ্রার পথে শুজা অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন অনেকখানি। রাজমহল থেকে পাটনা হয়ে জলে স্থলে তাঁর বিপুল বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে রোহতাস, চুনার ও বারাণসীর শাসন কর্তারা মহা সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এলাহাবাদ দুর্গে কোন প্রতিরোধই ছিল না, শুজা অবলীলায় দুর্গ অধিগ্রহণ করলেন। এরপর তিনি এসে পেঁছিলেন খাজুয়ায়। কিন্তু এখানেই থামতে হল তাঁকে। তাঁর বাহিনীর গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল আওরঙগজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মুহাম্মদ।

পুত্রকে আওরঙগজেব পত্রযোগে জানিয়েছিলেন, এ যুদ্ধ তোমার, এর জয় পরাজয় তোমার ভাগ্যকেই গড়ে দেবে।

এ কথা কেন লিখেছিলেন আওরঙগজেব? সুলতান মুহাম্মদ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বলে এবং তারই সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হবার সম্ভাবনা আছে বলে? অথবা এতবড় যুদ্ধে তরুণ এক বীরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আগাম এই প্রতিশ্রুতি?

এমনও তো হতে পারে, পুত্রকে গুরুদায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে

পাঠাবার পরে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল শুজার কন্যার কথা। তিনি তাঁর বেগমসাহেবার মুখ থেকে একসময় জেনেছিলেন, সুলতান মুহাম্মদ নাকি কখনো সখনো একটা পারাবতের মাধ্যমে শুজার কন্যার সঙ্গে খবর বিনিময় করে।

আওরঙ্গজেব যুদ্ধের পূর্বে কথাটা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময় কথাটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলার দূরত্ব কিছু কম নয়। একটা পাখির পক্ষে এতখানি পথ চিনে আসা যাওয়া করা খুব সম্ভব বলে তাঁর মনে হয় নি।

এখন যুদ্ধের সময় ঐ তুচ্ছ ব্যাপারটি বেশ গুরুত্ব নিয়ে তাঁর মনে উদিত হতে পারে, হয়ত তাই এই সাবধান-বাণী।

শুজার বাহিনীর রণস্থলে পেঁছিনোর তিনদিনের ভেতরেই পেঁছে গেলেন আওরঙ্গজেব। স্বাভাবিকভাবেই বাহিনীর দায়িত্বভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন তিনি। এটি তাঁর পথের শেষ কন্টক। স্বয়ং উপস্থিত থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে একে।

প্রথম দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষে কেবলমাত্র গোলাগুলি বিনিময়ই হল। দ্বিতীয় দিনে শুরু হল মুখোমুখি সংগ্রাম।

দ্বিতীয় দিন রাত্রি শেষে আওরঙ্গজেবের বাহিনীতে ঘটল একটি বিপর্যয়। বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন যোধপুরের মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। তিনি ছোটখাট কিছু কারণে নিজেকে অসম্মানিত বোধ করছিলেন। এবার তাঁর মনে প্রতি-হিংসার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল। তিনি গোপনে শাহজাদা শুজার কাছে দূত পাঠিয়ে লিখে জানালেন, তিনি ভোরের আলো ফোটার আগেই তাঁর রাজপুত বাহিনীকে নিয়ে চলে যাবেন আগ্রা অভিমুখে। তাঁকে যখন পেছন ফিরে মোগলবাহিনী আক্রমণ করবে তখন শুজা যেন সেই সুবর্ণ সুযোগটি ত্যাগ না করেন। তিনি যেন অবশ্যই ঝাঁপিয়ে পড়ে বিধ্বস্ত করে দেন তাঁর বিপক্ষকে।

শুজা পত্রখানি পেয়ে ভাবলেন, এটি কূটকৌশলী, মিথ্যাচারী আওরঙ্গজেবেরই একটি চাল। তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্যই এই পরিকল্পনাটি করা হয়েছে।

কিন্তু মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী

কাজ করলে হয়ত সেদিন ভারত-ইতিহাসের এই পর্বটি অন্যভাবে রচিত হত।

সহসা অন্ধকারের ভেতর আওরঙ্গজেবের বাহিনীতে শুরু হয়ে গেল প্রবল হুড়োহুড়ি। কারা যেন ঘুমন্ত সৈন্যদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। লুণ্ঠিত হচ্ছে সবকিছু। সামান্যতম বাধা দিতে গেলেই অসির কোপ এসে পড়ছে ঘাড়ের ওপর।

ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রবল হৈ হল্লা শুনে সৈন্যদের অনেকেই ভাবল, শত্রুপক্ষ অতর্কিতে আক্রমণ করেছে তাদের। অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল প্রাণ হাতে নিয়ে। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য আর চৌদ্দ হাজার রাজপুত সৈন্যসহ আগ্রার দিকে ধাবিত হলেন যোধপুরের মহারাজ।

নমাজ পড়ছিলেন আওরঙ্গজেব। সেনাপতিরা এসে তাঁকে যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে গেল। আওরঙ্গজেব কিন্তু বিচলিত হলেন না। তিনি শান্ত চিত্তে আল্লার কাছে প্রার্থনা শেষ করলেন। মনে মনে ভাবলেন, আল্লা যা করেন মঙ্গলের জন্য। যুদ্ধের মাঝখানে হঠাৎ যদি যশোবন্ত চলে যেতেন তাহলে সে বিপর্যয় রোধ করা যেত না।

যুদ্ধ শুরু হল প্রভাত সাড়ে আট ঘটিকায়।

আওরঙ্গজেব বিশালাকার এক হস্তীর ওপর আরোহণ করে অগ্রসর হলেন। বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান করছিলেন তিনি। পাশে অন্য একটি হস্তীপৃষ্ঠে স্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা রণনিপুণ মীরজুমলা। দক্ষিণে বামে দূরপ্রসারী দুটি পক্ষ সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতিকুল।

আক্রমণ শুরু হল শাহজাদা শুজার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। শুজার অন্যতম সেনাপতি সৈয়দ আলম প্রথমেই আওরঙ্গজেবের বাহিনীর বামবাহুতে আঘাত করলেন। তিনি তিনটি প্রায় উন্মত্ত হস্তীকে তাড়না করলেন শত্রুসৈন্যের অভিমুখে। প্রতিটি হস্তীর শুঁড়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দুমন ওজনের লৌহ শৃঙ্খল। তারা নির্বিচারে আঘাত হানতে হানতে অগ্রসর হল। বহু যোদ্ধা মারা পড়ল আঘাতে। ত্রাসে পালাতে লাগল অধিকাংশ সৈন্য। প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আওরঙ্গজেবের বাহিনীর বামপক্ষ।

একটি উন্মত্ত হস্তী ধাবিত হল আওরঙ্গজেবের হস্তীটির দিকে। প্রমাদ গণল সেনাপতিরা। যদি আওরঙ্গজেবের হস্তীটি ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে সমস্ত সৈন্যেরা ভাববে, রণে ভঙ্গ দিলেন সম্রাট। তাহলে নেমে আসবে নিদারুণ বিপর্যয়। ওদিকে কে যেন রটনা করে দিল, আওরঙ্গজেব মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

আবার সৈন্যদের ভেতর ত্রাসের সঞ্চার হল। ভেঙে যেতে লাগল শৃঙ্খলা। সেই সুযোগে শুজার সৈন্যেরা ধেয়ে এল সম্রাটের দিকে।

এ ধরনের অন্তিম পরিস্থিতিতে আওরঙ্গজেব কিন্তু স্থির, অবিচল। তিনি মুহূর্তে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে হস্তীর পদদ্বয় শৃঙ্খলিত করার আদেশ দিলেন। নিজে দণ্ডায়মান হলেন হস্তীর ওপরে। একটি অনড় পর্বত বলে মনে হচ্ছিল তাঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদেশ দিলেন, উন্মত্ত হস্তীটির মাহুতকে তীরবিদ্ধ করতে। আদেশ পালিত হল এবং মাহুতটি পড়ে গেল মাটিতে। তখন কয়েকটি হস্তী বেষ্টন করে ধরল উন্মত্তটিকে। একজন সাহসী মাহুত লাফিয়ে উঠল হস্তীটির ওপর। অন্য দুটি হস্তী তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে! সম্রাটকে হস্তীর ওপরে পতাকার তলায় সশরীরে দেখে উল্লাস, উত্তেজনায় ফেটে পড়ল যোদ্ধারা।

এবার শুজার সৈন্যরা পিছু হটতে লাগল। আওরঙ্গজেবের গোলন্দাজ বাহিনী কামান দাগতে লাগল ঘন ঘন। কামানের গোলায় উড়ে যাচ্ছিল মানুষের মুণ্ড, হাত, পা, ধড়। শুজার সৈন্যদের ভেতর ত্রাসের সৃষ্টি হল। অধিক অভিজ্ঞ সৈন্য ছিল না শুজার বাহিনীতে। বাংলাদেশের চাষাভূষো, বিহারের দেহাতিরাই প্রধানত স্থান পেয়েছিল শুজার সৈন্যদলে। তারা স্থলযুদ্ধের কলা কৌশল যথাযথভাবে রপ্ত করতে পারেনি। শুধু নাওয়ার যোদ্ধারা ছিল জলযুদ্ধে পটু। শুজা বাংলাদেশ থেকে অজস্র নৌকো এনে জড়ো করেছিল নদীতে। পর্তুগীজ গোলন্দাজরা ছিল সেই নৌ-বাহিনীর পরিচালনায়। কিন্তু বিশেষ কিছু কাজে লাগল না এই আয়োজন। কেবল নৌকোতে হাজার হাজার সৈন্য বয়ে আনাই সার হল।

আওরঙ্গজেবের গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল শুজার সৈন্যেরা।

একটি গোলা হঠাৎ উড়ে এসে পড়ল শুজার হস্তীটির অল্প খানিক দূরে। চোখের সামনে উড়ে গেল একটি মুণ্ড।

মীর ইসফান্দিয়ার মামুরী শুজার পাশে ঘোড়ার ওপর বসেছিলেন। তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন, জাঁহাপনা, হাতির ওপর থেকে শীঘ্র নেমে আসুন। এত উঁচুতে থাকলে আপনি গোলন্দাজদের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠবেন। এই নিন আমার ঘোড়া। এতে চড়ে আপনি সহজেই সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে বেড়াতে পারবেন।

শুজা নেমে পড়লেন হাতির ওপর থেকে, সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে গেল তাঁর ভাগ্য।

সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে দেখল, তাদের প্রভু শাহজাদা শুজার হাতি আরোহী বিহনে লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিশ্চয়ই গোলার আঘাতে উড়ে গেছেন তাদের প্রভু, সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা অর্থহীন। পালাও, পালাও, রব উঠল চারদিকে। শুজা ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে, প্রাণফাটা চীৎকার করেও সৈন্যদের পলায়ন রোধ করতে পারলেন না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শুজার বাহিনী প্রায় শূন্য হয়ে গেল। কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণের বিনিময়ে শুজা নদীতীরে এসে নৌকো-যোগে পালাতে সক্ষম হলেন।

আওরঙ্গজেবের শিবির থেকে সন্ধ্যার আকাশ কাঁপিয়ে ঘন ঘন বাজতে লাগল বিজয় ভেরী।

অন্ধকারে মুখ ঢেকে প্রায় শূন্য নৌবহর নিয়ে পালাতে লাগলেন শাহজাদা শুজা।

ভাগ্যতাড়িত পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে রাজধানীতে ধরে আনার জন্য আওরঙ্গজেব রেখে গেলেন তাঁর পরামর্শদাতা সেনাধ্যক্ষ মীরজুমলা ও পুত্র সুলতান মুহাম্মদকে।

দুজনেই খাজুয়া থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে শাহজাদা শুজাকে তাড়া করতে করতে এসে পৌঁছলেন রাজমহলে। শুজা গঙ্গার

পশ্চিম কূল ছেড়ে পরপারে গিয়ে উঠলেন। সেখানে তন্দায় রাখলেন তাঁর সমস্ত পরিবার, পরিজনকে।

গঙ্গার কূল বরাবর বিভিন্ন স্থানে বসালেন কামান। নৌবহর নিরন্তর ঘুরে বেড়াতে লাগল গঙ্গার বুকে।

অন্যদিকে রাজমহল অধিকার করেও মীরজুমলা শান্তি পেলেন না মনে। এপারের বহু নৌকো ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন শুজা, যাতে শত্রুপক্ষ সৈন্য নিয়ে ওপারে যেতে না পারে।

মীরজুমলা গঙ্গার পশ্চিম বরাবর দুটো ঘাঁটি করলেন। রাজ-মহলের তের মাইল দক্ষিণে দোগাছি, আরও দক্ষিণে সুতি। প্রথম ঘাঁটি আগলে রইল সুলতান মুহাম্মদ আর সুতিতে রইলেন মীরজুমলা। তিনি নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন নদী পার হয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য।

কয়েকটি নৌকো নিয়ে রাতের অন্ধকারে পারাপারের চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। শত্রুর সজাগ দৃষ্টি এড়াতে পারেননি।

এখন তিনি বিহার প্রদেশ থেকে কিছু নৌকো সংগ্রহের জন্য লোক পাঠালেন। নদীর উত্তর দিক দিয়েও ওপারে যাবার পথ খুঁজতে লাগলেন।

মীরজুমলা যখন এমনি সব পরিকল্পনা নিয়ে ভারাক্রান্ত তখন দোগাছিতে নিঃশব্দে আর একটি ঘটনা ঘটে চলছিল।

তরুণ সুলতান মুহাম্মদের হৃদয় অত্যন্ত বেদনা-বিধুর। যুদ্ধের জয় পরাজয় তার মনের মধ্যে আর কোনরকম অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারছিল না। সারা মন জুড়ে তখন একটি ময়ূর তার সমস্ত পেখম ছড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল।

গতরাতের নিদ্রা সুলতান মুহাম্মদের চোখের ওপর বুলিয়ে দিয়েছিল স্বপ্নের এক মোহাঞ্জন। সে দৃশ্য, সে অনুষ্ঠান জাগরণেও ভুলতে পারছিল না তরুণ বিরহী।

আগ্রার প্রাসাদ, বিবাহ-উৎসব-সজ্জায় ইন্দ্রপুরীর মত সুসজ্জিত।

আওরঙ্গজেবের যমুনাতীরের নিজস্ব প্রাসাদটি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে একটি শোভাযাত্রা। পথের দুদিকে লণ্ঠনবাহকেরা

চলেছে সারবন্দী হয়ে। সুসজ্জিতা নারী পুরুষ মেতে উঠেছে আনন্দ-রঙ্গ-লীলায়। অগণিত দাসদাসীর হাতে উপহার সামগ্রী। রোশনাইয়ের আলোয় সারা আকাশ পুষ্পিত।

এটি 'হেনাবন্দী' উৎসব-যাত্রা। বিবাহের পূর্বরাত্রে পাত্রের হস্তপদ রঞ্জিত হবে হেনার রক্তিম রসে। পাত্রীর পিতা তাই শোভা যাত্রা করে হেনা পাঠাচ্ছেন পাত্রের গৃহে।

হেনার সঙ্গে সুরুচিসম্পন্ন পাত্রে নিয়ে আসা হচ্ছে উপহার সামগ্রী! পাত্রের জন্য বহু মূল্যবান একপ্রস্থ পোশাক, গন্ধদ্রব্য, প্রাত্যহিক ব্যবহার সামগ্রী ও রসনা তৃপ্তিকারী মিষ্টান্ন সম্ভার। কতকগুলি পাত্রে স্তূপীকৃত শুষ্ক ফল। পাত্রের আত্মীয় স্বজনের জন্য সূচীকর্মসমৃদ্ধ উত্তরীয়। সর্বশেষে দৃষ্টিনন্দন একটি পাত্রে নিয়ে আসা হচ্ছে কিছু পরিমাণ মিছরি, যার মধ্যে রয়েছে সৌভাগ্য-পূর্ণ মধুর জীবনের আস্বাদ। মুখরোচক সুগন্ধী পানের খিলি দাসীর হাতে বাহিত হচ্ছে পিত্তল নির্মিত কয়েকটি তাম্বুলাধারে।

শোভাযাত্রা পেঁছিবার পর অতি সুশোভিত একটি প্রশস্ত কক্ষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে উপহার সামগ্রী। পাত্রপক্ষের আত্মীয় স্বজনেরা ঘুরে ঘুরে দেখে ঘন ঘন তারিফ করছে কনের বাড়ীর তত্ত্বের। বাইরের আসর নাচে গানে জমে উঠেছে তৎক্ষণে। নর্তকীরা নাচছে, তাদের সঙ্গে যন্ত্রবিদরা বাজাচ্ছে নানা ধরনের শ্রুতিসুখকর যন্ত্র। মাঝে মাঝে গান হচ্ছে, লঘুচালের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত।

হৈহৈ পড়ে গেছে অন্দরমহলে। হেনাবন্দী হতে আসছে পাত্র। সবুজ, হলুদ, লাল, নীল, বেগুনী রঙের এক ঝাঁক পাখি কলরবে মাতিয়ে তুলছে মহলের সুসজ্জিত কক্ষগুলি। বাতায়নে উঁকিঝুঁকি চলেছে! রঙ্গীলারা ছুঁড়ে মারছে মজাদার রঙ্গকৌতুক কথা।

এবার পাত্রকে নিয়ে আসা হয়েছে একটি নিভৃত কক্ষে। সেখানে পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে আছে কয়েকজনমাত্র নির্বাচিত মহিলা। তারা পাত্রের হাত পা চিত্রিত করল হেনার রক্ত-রঙীন রসে। তারপর তাকে পরানো হল, কনের বাড়ীর উপহার দেওয়া পোশাক। গায়ে মাথায় ছড়িয়ে আর মাখিয়ে দেওয়া হল, গন্ধ-

সামগ্রী। শেষে একখণ্ড মিছরি খাইয়ে দিয়ে বলা হল,—মধুর হোক তোমাদের মিলন।

এরপর পাত্রের আত্মীয় স্বজনের হাতে তুলে দেওয়া হল এক একখানি কাজকরা উত্তরীয়। মিষ্টান্ন বিতরিত হল। শেষে তাম্বুল গ্রহণ করলেন আত্মীয় পরিজনেরা।

পাত্র অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে সামাধা করল তার রাতের ভোজন।

পরদিন বিবাহ-রজনী। গণনাকারী জ্যোতিষীরা শেষ রাতেই বিবাহ-লগ্ন স্থির করলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে বিয়ের সাজে সুসজ্জিত পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে সম্রাটের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গেছেন আওরঙ্গজেব।

পৌত্র সুলতান মুহাম্মদকে আশীর্বাদ জানালেন সম্রাট। উপহারস্বরূপ দিলেন মূল্যবান পোশাক, হীরে জহরত, খোদাই করা ছুরিকা, হস্তী আর অশ্ব। বিবাহের জন্য যে পাগড়ীটি পরানো হয়েছিল, সম্রাট নিজের হাতে তাতে আটকে দিলেন মুক্তার ঝালর।

এরপর শুরু হল বরযাত্রীদের নিয়ে নগর-পরিক্রমা। রোশনাইয়ের ফুলে ছেয়ে গেল সারা আকাশ। পথ জুড়ে যেন বসেছে নাচ আর গানের আসর। কিছুক্ষণ যাত্রায় বিরতি, আবার চলা। আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত প্রতিটি গৃহকোণ। সুসজ্জিত, অগণিত হস্তী আর অশ্বের সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা। আরোহীরা এমনই সুশোভিত যে শ্রেষ্ঠ কোন শিল্পীর হাতে আঁকা আলেখ্য বলে ভ্রম হয়।

পাত্রীর গৃহও তেমনি সুসজ্জিত। আন্তরিকতাপূর্ণ আপ্যায়নে চতুর্দিক উদ্বেলিত। বর্ণে, গন্ধে, গানে, আলোতে হাসিতে এ রাত্রি যেন বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে মনে হচ্ছিল।

বিবাহের পর সম্রাট শাজাহান পৌত্র সুলতান মুহাম্মদ আর পৌত্রী নববধূরূপী গুলরুখকে প্রাসাদে নিয়ে আসছেন। একখানি আলোকমালায় শোভিত ময়ূরপঙ্খীতে নিজের পাশে বসিয়ে যমুনা নদী দিয়ে নিয়ে আসছেন বরবধূকে। একেবারে আলোর কলাপ মেলে ধরেছে ময়ূরপঙ্খীর বর্ণময় ময়ূরটি। সে আসছে যমুনার

মাঝখান দিয়ে। নদীর দুই তীরে নোঙর করা সারি সারি আলোকিত নৌকো দোল খাচ্ছে তরঙ্গের আঘাতে। তাদের আলোর কম্পনে যমুনার তরঙ্গে ঝিলিমিলি। সেই রুপোলী স্রোতের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছিল ময়ূর। দুই তীর লোকে লোকারণ্য। আকাশেও আনন্দের ফুল ফুটছিল।

ঘুম ভেঙে যাবার পর থেকে সেই যে বিষণ্নতা ঘিরে আছে, তাকে কোনভাবেই মুছে ফেলতে পারল না সুলতান মুহাম্মদ। তার চোখের ওপর কেবলই ছায়া ফেলতে লাগল একটি মুখ। জ্যোৎস্না রাতে গঙ্গায় নৌবিহারের সময় যে মুখখানা পদ্মের মত ফুটে উঠেছিল তার বুকের মধ্যে।

সেদিনের সেই আধফোটা রক্তকমলটি রাতের স্বপ্নে পূর্ণ বিকশিতা।

বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল তরুণ প্রেমিকের। সে ভুলে গেল বিরাট এক যুদ্ধের দায়িত্ব নিয়ে সে অপেক্ষা করছে গঙ্গার কূলে।

সাম্রাজ্য নয়, সে এখন চায় তার প্রার্থিত নারীটিকে। তাকে পেলেই তাব বিশ্বজয় হয়ে যাবে। সে চায় না দিল্লীর সিংহাসন।

সেই রাত্রে সুলতান মুহাম্মদ প্রবল ঝড়বৃষ্টির ভেতরে তার পাঁচজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে নিয়ে নৌকো-যোগে পার হয়ে গেল গঙ্গা।

তন্দায় পৌঁছলে শাহজাদা শুজা প্রথমে তাকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। পরে তার অন্তরের কথাটি শুনে জড়িয়ে ধরলেন গভীর আবেগে।

শুজা প্রথমেই দুটি তরুণ-তরুণীর মিলনের ব্যবস্থা করলেন। বহু প্রতীক্ষার পর চোখেব জলে, বুকের উত্তাপে পূর্ণ হল মিলন।

শুজা সেই ভয়াবহ ভাগ্য বিপর্যয়ের ভেতরেও এত খুশী হয়ে উঠলেন যে তিনি তাঁর নতুন জামাতাকে বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত করলেন।

রাতের শয্যায় গুলরুখ কাঁদতে লাগল তার ভালবাসার মানুষটির বুকে মাথা রেখে।

গুলরুখ কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি এখনও সম্রাট শাজাহানের অতি প্রিয় দৌহিত্র। হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপরিবারের এই কি বিবাহের নমুনা। সামান্য সানাইয়ের সুর শোনা গেল না।

ফুল, রোশনাই, উপহার, সবই নাগালের বাইরে রয়ে গেল। কেবল মোল্লা এসে সিদ্ধ করে গেল সাদিটা।

সুলতান মুহাম্মদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তোমাকে বুকের মধ্যে পেয়েছি, আমি আজ সত্যই আলমগীর (বিশ্ব বিজয়ী) গুলরুখ। কে বলল উৎসবের বাদ্যধ্বনি হয়নি। বর্ষার মেঘে প্রকৃতিই তো বাজিয়ে চলেছে তার শ্রেষ্ঠ বাজনা। বিদ্যুতে স্নান করে দিয়েছে সহস্র রোশনাইয়ের আলো।

ফুল নেই বাংলাদেশে, একি বিশ্বাস করতে বল? তোমাদের গৃহের আঙিনায় সারি সারি কদম্ব গাছে ফুটে আছে বর্ষার ফুল। আমি তো এখানে শুয়েও ভেজা বাতাসে গন্ধ পাচ্ছি মল্লিকার।

উপহার তো তোমার আব্বাজান দিয়েই দিয়েছেন আমাকে। এতবড় একটা যুদ্ধের আমিই সর্বাধিনায়ক।

গুলরুখ বাধা দিয়ে বলল, তোমার এই পদ আমি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারিনি মালেক। প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় যে পাখিটার ডানা ভেঙে গেছে তাকে আকাশে ওড়ানোর অসম্ভব দায়িত্বটি তোমার ওপরেই সঁপে দিয়েছেন আব্বাজান।

আমি এই সম্মানের মর্যাদা রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব গুলরুখ। আমার পিতার ব্যবহারে আমি যে কতখানি মর্মাহত তা তোমাকে বলে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গোলকুণ্ডা অবরোধে আমাকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হল, কিন্তু সেখানে আসল ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল সেনাপতিদের হাতে।

গুলরুখ বলল, তুমি তরুণ, তাই হয়তো তিনি পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারেননি তোমার ওপর।

সুলতান মুহাম্মদ উত্তেজিত হয়ে উঠল, কেন, খাজুয়ার যুদ্ধে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিরা কোথায় গেলেন?

আগেই যশোবন্ত সিংহ পালালেন তাঁর রাজপুতবাহিনী নিয়ে। তারপর যুদ্ধের মাঝখানে একটা বিপর্যয় দেখে রণে ভঙ্গ দিল অনেকেই। দক্ষিণ বাহুটি আগলে মৃত্যুপণ করে সেদিন কে লড়াই চালিয়েছিল? কে হটিয়ে দিয়েছিল শত্রুদের।

এই রাজমহলে আসার সময় আব্বাজান আমাকে অধিনায়ক

করে পাঠালেন কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন মীরজুমলার ওপর।

গুলরুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি রাজনীতি বুঝিনা মালেক। তবে একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছে, নতুন করে যুদ্ধের ভার কেন নিতে গেলে!

গুলরুখ, আমার কেবলই মনে পড়ে একটি মানুষের মুখ। দাক্ষিণাত্য থেকে যখন আগ্রায় আসতাম তখন নিভৃত একটি জায়গায় সম্রাট আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। অনেক আদর করে অদ্ভুত একটি কথা বলতেন, তুমি নেবে ভাই আমার মুকুটখানা? এটার ভার আমি আর বইতে পারছি না।

আমি ছোট ছিলাম তাই জানতে চাইতাম, মুকুট না থাকলে তো তোমাকে সম্রাট বলে কেউ মানবে না, তখন তুমি কি করবে?

সম্রাট বলতেন, তোমার ঐ দাদির কবরের কাছে গিয়ে রোজ বসে থাকব। সানকিতে করে দুবেলা শুধু দুটি খেতে দিও।

আজ সেই প্রেমিক সম্রাট বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন আগ্রার দুর্গে। আমি যুদ্ধ করলে তাঁকে মুক্ত করার জন্যই করব।

গুলরুখ সুলতান মুহাম্মদের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি কবি, তোমার বুকখানা আকাশের মত। এই মাটির পৃথিবীর হানাহানিতে তোমাকে যেন মানায় না।

কয়েকমাস পরেই এলো সেই বিপর্যয়ের দিন। গুলরুখ সংগোপনে সরবরাহ করল একটি সংবাদ, আব্বাজান ঢাকার শাসনকর্তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন যুদ্ধের হাল ধরার জন্য। তাঁর অনুমান, যুদ্ধ যেহেতু বাংলাদেশের ভেতর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে সেহেতু বাংলাদেশের হালচাল, পথঘাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন মানুষেরই প্রয়োজন।

এখন আমার কর্তব্য কি গুলরুখ?

আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে আমি বলব, তোমার প্রথম কর্তব্য, আত্মসম্মান রক্ষা।

আমি আব্বাজানের কাছে ফিরে যেতে চাই, ভাগ্যে যাই থাক।

গুলরুখ বলল, তুমি আমার স্বামী, এখন বলে দাও আমার কি কর্তব্য?

মনে মনে খানিক ভেবে নিয়ে সুলতান মুহাম্মদ বলল, এই মুহূর্তে যে অনিশ্চয়তার ভেতরে আমি পা দিতে যাচ্ছি সেখানে কোনরকমেই আমি তোমাকে টেনে নিয়ে যাব না। যদি সুদিন আসে তাহলে সম্রাট শাজাহানের দৌহিত্রী সসম্মানে আগ্রার প্রাসাদে প্রবেশ করবে।

গুলরুখ কান্নাভেজা গলায় বলল, আমি সারা জীবন তোমার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকব মালেক।

এক বর্ষণঘন ঝড়ের রাতে গঙ্গা পার হয়ে প্রেমিকার টানে এসেছিল সুলতান মুহাম্মদ, আবার কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের এক সন্ধ্যায় সে ফিরে গেল ওপারে অজ্ঞেয়, অনিবার্য ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করতে।

পিতার অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ক্ষমা করলেন না আলমগীর। চির নির্বাসনে পাঠালেন গোয়ালিয়র দুর্গে। একদিন দেখা গেল দুর্গের প্রশস্ত সোপান বেয়ে হাতিপুলের সুরম্য তোরণ অভিমুখে অবলীলায় উঠে চলেছে তরুণ এক বন্দী। অনিন্দ্য মুখকান্তি তার। মৃদু হাসির একটি রেখা ফুটে উঠেছে মুখে। হয়ত সে ভাবছে, একদিন যে পেতে পারত সম্রাটের সিংহাসন সে আজ কঠিন প্রস্তর দুর্গে চিরনির্বাসিত। ভাগ্য, আশ্চর্য তোমার খেলা! টুকরো হাসির অর্থটুকু হয়ত নিহিত ছিল এরই মধ্যে।

ভাগ্য আর এক শাহজাদাকেও নিষ্ঠুর নির্বাসন দণ্ড দিয়ে পাঠিয়ে ছিল স্বভূমি হিন্দুস্থান থেকে আরাকানের অপরিচিত অরণ্য-রাজ্যে।

পরাজিত শুজা সপরিবারে মাত্র তিনশত জন সঙ্গী নিয়ে আশ্রয়ের আশায় পলায়ন করলেন আরাকানে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চ এবার উন্মোচন করল তার শেষ দৃশ্যপট।

যে আশ্চর্য অঙ্গুরীটি বসুধর্মা পরিয়ে দিয়েছিলেন রেশমীর করাঙ্গুলিতে যেন সেই অঙ্গুরীর টানেই আফরোজের ছদ্মবেশে রেশমীকে এসে দাঁড়াতে হল আরাকানের মাটিতে। একদিন সবার অলক্ষ্যে সে চলে গেল মহামুনির মন্দিরে। সেখানে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলল, হে প্রভু, এই আশ্চর্য অঙ্গুরীয় রেখে গেলাম তোমার চরণে। এর গুরুভার থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

দর্শনদান কক্ষে দর্শনপ্রার্থীদের আবেদন নিবেদন স্বকর্ণে শুনে প্রতিবিধান করছিলেন আরাকানের মহারাজ। এক সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক তরুণ। মনে হল, কোন দেবদূত নেমে এসেছে দেবলোক থেকে। অপার সৌন্দর্যে ভরা মুখশ্রী। সুঠাম অবয়ব। মূল্যবান পোশাকে দেহ আবৃত। গলায় একনরী অত্যন্ত মহার্ঘ্য মুক্তোর মালা।

তরুণ মাথা নত করে সেলাম জানাল মহারাজকে।

আরকানরাজ বললেন, কেমন আছেন তোমার পিতা? আমি রাজভাণ্ডার থেকে তোমাদের নিত্যকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে আদেশ দিয়েছি। সেদিক থেকে কোন অসুবিধার কারণ ঘটেনি তো?

না মহারাজ, তবে আব্বাজান দুটি কথা আপনাকে নিবেদন করতে বলেছেন।

বল, আমি যথাসাধ্য তা রক্ষা করার চেষ্টা করব।

আপনার ভাণ্ডার থেকে যে বিপুল পরিমাণ রসদ সরবরাহ হচ্ছে তার মূল্য আমাদের পরিশোধ করতে দিন।

আরাকানরাজ বললেন, আজ পর্যন্ত তোমরা আমার অতিথি। এ অর্থ তোমাদের আর পরিশোধের প্রশ্ন ওঠে না। আগামীকাল থেকে নগর-বিপণিতে নির্দেশ দেওয়া থাকবে, তারা অর্থের বিনিময়ে তোমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সরবরাহ করবে।

তরুণ বলল, বিশেষ অনুগ্রহ আপনার।

তোমার দ্বিতীয় কথাটি এবার বল।

আব্বাজান আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, অনুকূল আবহাওয়ায় মক্কা যাত্রার জন্য একটি অথবা দুটি জাহাজের ব্যবস্থা করে দিন। অবশ্যই আমরা তার সমস্ত খরচ বহন করব।

আরাকানরাজ একটুখানি ভেবে বললেন, সামনের দুটো মাস সমুদ্রে ঘূর্ণী ঝড়ের তাণ্ডব চলবে। সে সময় দূরে কোথাও যাত্রার কথা ভাবাই যাবে না।

তরুণ বলল, ঝড়ের দাপট কমে যাবার পর জাহাজ পাওয়া কি সম্ভব হবে?

সে ব্যবস্থা আমি করে দেব, নিশ্চিন্তে থেক।

আবার অভিবাদন জানিয়ে তরুণ যাবার জন্য তৈরী হল। মহারাজ বললেন, শাহজাদা আসেন না কেন? এলে গল্পগুজবে মনের ভার কিছু লাঘব হত।

তরুণ মাথা নীচু করে বলল, আব্বাজান বড়ই ক্লান্ত আর অবসন্ন, কিছু পরিমাণে অসুস্থও বলতে পারেন। তিনি ক্রমাগত বিশ্রাম আর চিকিৎসার মধ্যে রয়েছেন। একটু সুস্থ বোধ করলে অবশ্যই আসার চেষ্টা করবেন।

মহারাজ আবার বললেন, তোমরা চারপাঁচজন ভাইবোন এসেছ শুনলাম?

হ্যাঁ মহারাজ, আমরা পাঁচজনেই এসেছি।

তোমার বোনেরা তো প্রাসাদের রানীমহলে এসে আলাপ পরিচয় করে যেতে পারে। এখানে অন্য কার সঙ্গেই বা গল্পগুজব করবে।

তরুণ বলল, এতো খুবই আনন্দের ব্যাপার। আমি আম্মার কাছে আপনার প্রস্তাব নিবেদন করব।

একটু থেমে আবার বলল, আম্মা অন্তঃপুর ছেড়ে কোথাও যান না, তিনি অত্যন্ত পর্দানশীন। তবে আমার বোন এসে আপনার রানীমহলে আলাপ করে যাবে।

অতি দুর্বল আর স্খলিত চরিত্রের মানুষ এই আরাকানের অধিপতিটি। নারী সান্নিধ্য লোভাতুর, ক্রোধী ও নৃশংস।

আফরোজ গুলরুখকে নিয়ে এক অপরাহ্নে প্রবেশ করল রানী-মহলে। অন্দরের তোরণ দ্বারেই ডুলি থেকে নামল দুজনে। বোরখায় সারা অঙ্গ ঢাকা।

রেশমী চট্টগ্রামে থাকার সময় একজন আরাকানী পরিচারিকার কাছ থেকে আরাকানের ভাষাটা শিখেছিল। তাই অন্দরমহলে ঢোকার ব্যাপারে তার কোন অসুবিধেয় পড়তে হল না।

মহারাজ পূর্বেই রানীমহলে শাহজাদা শুজার পরিবারের মহিলাদের আলাপ করতে আসার কথাটি বলে রেখেছিলেন। তাই গুলরুখ আর আফরোজ মহিলামহলে ঢোকা মাত্রই রানীরা খাতির করে বসাল ওদের দুজনকে।

গুলরুখের রূপ দেখে মহারাজের প্রায় পঁচিশ জন রানীর

চোখের পলক যেন আর পড়তেই চায় না। এত সৌন্দর্যও এ দুনিয়ায় সম্ভব। প্রত্যেকেই কথা বলতে চায় গুলরুখের সঙ্গে। আফরোজ সাধ্যমত তর্জমা করে বুঝিয়ে দেয়। গুলরুখ মার্জিত বাদশামহলের কেতায় উত্তর দিতে থাকে। রানীরা কখনো হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে, আবার কখনো বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলে।

গুলরুখ একটি ছবি দেখে অবাক হয়েছে। পঁচিশ জন রানী পরেছে পঁচিশ রকমের পোশাক। তাদের কেশ বিন্যাস, অলংকারের গঠন, সবই স্বতন্ত্র।

কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না গুলরুখ। সে এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ জিজ্ঞেস করল।

উত্তরে জানল, মহারাজ তাদের এনেছেন পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তারা তাদের সঙ্গে করে এনেছে এক একজন সুদক্ষ পরিচারিকা। সেই সেবিকারাই নিজের নিজের অঞ্চলের বিশেষ সাজসজ্জায় সাজিয়ে তোলে রাণীদের।

রানীদের সঙ্গে কথা শেষ হলে ওদের ভেতর থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মহারানী বিলাস-কুঞ্জে রয়েছেন, চলুন ওঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাই।

আবার কটি তোরণ পেরিয়ে ওরা এসে পেঁছিল একটি অঙ্গনে। লতায়, ফুলে ছাওয়া অঙ্গনটি। পাথরের তৈরী উপবেশনের আসন পাতা। গুলরুখ আর আফরোজকে একটি আসনে বসতে বলে পথ-প্রদর্শিকা রানী ফিরে গেল অন্দর মহলে।

একটি নিবিড় লতা-বিতানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মহারানী। সঙ্গে সঙ্গে গুলরুখ আর আফরোজ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল!

মহারানী একটি আসনে ওদের মুখোমুখি বসলেন।

একসময় সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন, শাহজাদার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা শুনে আমরা খুবই ব্যথিত। মহারাজ আফসোস করে বলেছিলেন, বাদশা আকবর ভারী মানী লোক ছিলেন। দুনিয়ার মানুষ তাঁর নাম জানত। তাঁরই বংশের ছেলেদের আজ এই পরিণতি। তাও আবার ভায়ে ভায়ে হানাহানির ফলে।

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল গুলরুখের গাল বেয়ে। মহারানী তাড়াতাড়ি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে এসে গুলরুখকে আদর করে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

বললেন, যখন তোমার মন খারাপ হবে চলে আসবে আমার এখানে। সারাক্ষণ মহারাজ রানীমহলে আনন্দের হাট বসিয়ে রেখেছেন। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, মহারাজ বড়ই প্রতাপ-শালী। ওঁর নামে একদিকে ব্রহ্মদেশ অন্যদিকে বাংলাদেশ ভয়ে কাঁপতে থাকে।

আফরোজ, ওরফে ছদ্মবেশী রেশমীর কেবলই মনে হতে লাগল, এই মহারাজটি কি সেই ভৃত্য, যার সঙ্গে মহারানী গোপন ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে আসল মহারাজ বসুধর্মাকে হত্যা করেছিলেন? যার ফলে বসুধর্মার খুল্লতাত, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মংগৎ রাই সেই ভৃত্যের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গিদের সহযোগিতায় নৌ-যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন? ভয়ংকর আরাকানী মগ দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে মংগৎ রাই পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন বাংলাদেশে।

যে যুদ্ধের সঙ্গে একদিন তার বাবা মা এবং তার নিজের ভাগ্যও জড়িত হয়ে পড়েছিল।

আফরোজ মনে মনে ভাবতে লাগল, ভাগ্য তাকে আজ কোথায় টেনে এনে ফেলেছে। কিন্তু সে তার মনের মধ্যে জেগে ওঠা প্রশ্ন গুলির কোন উত্তর খুঁজতে গেল না।

সেদিন মহারানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল ওরা। লতাবিতানের আড়াল থেকে আরাকানরাজ গুলরুখের অপার সৌন্দর্য লক্ষ্য করলেন। তাঁর মনে হল, এই আশমানের চাঁদটিকে নামিয়ে আনতে হবে রানীমহলে।

প্রবল বন্যা এবং ঝড়ে যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেল দেশটা। উত্তরের অরণ্যে ঘূর্ণিঝড় বিশাল বনস্পতির জটায় পাক দিতে দিতে তার শাখা পল্লব আচ্ছাদিত শিরোদেশকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। নদীতে, সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গের তলায় ডুবে গেল কত জলযান। পাহাড়

থেকে নদী বেয়ে নেমে আসতে লাগল বর্ষার প্রবল জলপ্রবাহ। ভাসিয়ে দিল আরাকানীদের ঘরবাড়ী, ক্ষেত খামার।

বেহাল কৃষিভূমি, কর্মহীন মানুষজন। খাদ্যের অভাবে বনের গভীরে ঢুকে কন্দমূল, ফল, যা পাওয়া গেল তাই খেতে লাগল। শস্যের অনটন কিন্তু প্রাচুর্য দেখা দিল মৎস্যের। তাই খেয়ে দেহকে বাঁচিয়ে রাখল মানুষ।

প্রজাদের এহেন বিপদে রাজার যেন কোন করণীয়ই নেই। তিনি ধরে নিয়েছেন, বিশেষ কর্মফলের জন্যই প্রজাদের এই দুর্ভোগ। গ্রহের প্রভাব কেটে গেলেই স্বস্তি ফিরে আসবে ধীরে ধীরে। যখন দুর্যোগ আসে তখন মানুষ অসহায়ের মত ঐ গ্রহের ফেরকেই একমাত্র কারণ বলে মেনে নেয়। এটা পুরুষানুক্রমে মিশে রয়েছে ওদের মজ্জার সঙ্গে।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিন্তু আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেল শাহজাদা শুজার তিন শত সদস্য বিশিষ্ট বৃহৎ পরিবার।

নগর-বিপণি বন্ধ হয়ে গেল একসময়। অধিক অর্থের বিনিময়েও খাদ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

ঠিক সেই অনটনের মুহূর্তে একসারি হাতির পিঠে বোঝাই হয়ে এল প্রায় একমাসের খাদ্যশস্য। রাজভাণ্ডার থেকে মহারাজ পাঠিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার অন্ত রইল না শাহজাদা শুজার। তিনি পুত্রের মাধ্যমে অর্থ পাঠালেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। মহারাজ কেবলমাত্র ধন্যবাদটুকু গ্রহণ করলেন, কিন্তু অর্থ গ্রহণ করলেন না।

এবার মহারানীর কাছ থেকে ডাক এল গুলরুখের। বর্ষার এই বিশ্রি দিনগুলো একা একা কাটাচ্ছ কি করে? চলে এসো আমাদের কাছে, আনন্দে কাটবে।

আফরোজ কিন্তু এই ডাককে সহজভাবে নিতে পারল না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কোন অজ্ঞাত কারণে এর ভেতর অনাগত একটা বিপদের গন্ধ পেল।

সে শুধু গুলরুখকে বলল, আমি ভাল বুঝছি না, না গেলেই বুঝি ভাল হয়!

গুলরুখ বলল, তোমার সঙ্গে যে দুদিন রানীমহলে গেছি, ওরা

বেশ খুশীর সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করেছিল। গল্প গুজব, হাসি গানে আনন্দের হাট বসিয়েছিল। কিছু সময়ের জন্য হলেও সরে গিয়েছিল আমার বুকে চেপে বসা পাথরখানা।

তোমার আব্বাজানের অনুমতি আছে এতে?

উনিই তো বললেন, মহারাজ যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। তোমার ভাই মহারাজকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছে। তুমি তোমার আম্মাজানের হয়ে মহারানীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসো।

আফরোজ বলল, মহামান্য সম্রাটের আদেশ অবশ্যই পালিত হবে।

আচ্ছা মৌলবীজী, এ সময় আব্বাজানকে সম্রাট বললে বিদ্রূপের মত শোনায় না কি?

আফরোজ বলল, চিরদিনই যাঁকে অন্তর থেকে সম্রাট বলে জেনে এসেছি, তাঁকে তো অন্য কোনভাবেই আর ভাবতে পারব না গুলরুখ।

রানীমহলের অঙ্গনে ওরা যখন পেঁছিল তখন খেলার একটা আসর বসে গিয়েছিল।

অঙ্গনের মাঝখানে একটি ফুলে ভরা গাছ। বর্ষার জলে ধুয়ে পাতাগুলো সবুজ ঝলমল করছিল। তারই তলায় একটি পাথরের আসনে বসেছিলেন মহারাজ ও মহারানী।

মহারাজের চোখ দুটি একটা হলুদ উত্তরীয়তে ভাল করে জড়িয়ে বাঁধা ছিল। তিনি কোনভাবেই দেখতে পাচ্ছিলেন না। রানীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহারানী ঘণ্টাধ্বনি করলেই শুরু হবে খেলা।

হঠাৎ ওদের দুজনকে আসরে ঢুকতে দেখে মহারানী চেঁচিয়ে একজন রানীকে নির্দেশ দিলেন, গুলরুখকে খেলার মধ্যে নিয়ে নাও।

ঐ রানী গুলরুখকে টেনে নিয়ে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, মহারাজের পাশ দিয়ে যাবার সময় সবাই একবার করে হাততালি দিয়ে যাবে, তুমিও তালি বাজিও।

গুলরুখ কেবল ঐটুকুই বুঝল, খেলার মাথামুণ্ডু আর কিছুই জানল না।

রানী আর একটি কথা বলে দিল, যে কেউ হাততালি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ যদি হঠাৎ হাত তোলেন, তাহলে তাকে মহারাজের কাছেই দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

মহারানী ঘণ্টাধ্বনি করলেন। খেলা শুরু হয়ে গেল।

আফরোজ এসে দাঁড়াল মহারাজ আর মহারানীর ঠিক পেছনে। আফরোজকে তাই মহারানী দেখতে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ আফরোজ শুনতে পেল, মহারানী চাপা গলায় বলছেন, নতুন বুলবুল, সতেরো।

আফরোজের মগজে কথাটা গিয়ে ধাক্কা দিল। সে গুনে দেখল ঠিক সতেরো সংখ্যাটিতে গুলরুখ চলেছে।

কিন্তু এই সংখ্যাটি চাপা গলায় বলার কারণ কি তা সে বুঝতে পারল না।

এক একজন রানী ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। রাজার কাছে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে, তারপর রাজাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রাজার হাত আর উঠছে না।

ঠিক ষোলটি হাততালি দিয়ে পর পর ষোল জন রানী বেরিয়ে গেল। এখন খেলার আসরে বাকী রয়েছে দশজন। এবার গুলরুখের পালা। গুলরুখ হাততালি দেওয়ামাত্রই হাত উঠল রাজার। নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেতে হল গুলরুখকে।

মহারানী এবার খুলে দিলেন মহারাজের চোখের বাঁধন।

চারদিকে দাঁড়িয়ে তখন করতালি দিয়ে চলেছে পঁচিশজন রানী।

অপ্রস্তুত, লজ্জিত ও সংকুচিত গুলরুখ দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে।

মহারানী আরাকানী ভাষায় বুঝিয়ে বললেন এই খেলার তাৎপর্যটি।

প্রতিদিন এমনি ভাবে নির্বাচিত হয় এক একজন রানী। সেই ভাগ্যবতীর ঘরেই মহারাজ নিশি যাপন করেন। কারু ভাগ্য সুপ্রসন্ন

না হলে তার পালা আসতে বিলম্ব হয়। কেউ বা রাজ-সান্নিধ্য ঘন ঘন লাভ করে ভাগ্যবলে।

আফরোজ মহারানীর উক্তিগুলির ভাষান্তর না করে গুলরুখকে বলল, এখন চল আস্তানায় ফিরি। ওখানে গিয়েই আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব।

গুলরুখ মহারাজ আর মহারানীকে সেলাম করে বেরিয়ে এল।

রানীরা কলহাস্যে বলতে লাগল, এবার এলে আর ছাড়ছি না।

আফরোজের মুখ থেকে সপরিবাবে বিস্তারিত ঘটনা শুনলেন শাহজাদা শুজা। তাঁর বাদশাহী রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বেগম সাহেবা শান্ত'কবলেন তাঁকে। কোন রকমে আরাকান ত্যাগ করতে হবে, সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরা একান্ত প্রয়োজন।

দুর্যোগের আবহাওয়া কেটে গেল, বেরিয়ে পড়ল আকাশেব গাঢ় নীল। শান্ত হয়ে এল সমুদ্র, স্থিব হল অশান্ত বাতাসেব মাতামাতি। সুমাত্রা, জাভা, যবদ্বীপ থেকে সাদা পাল তুলে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল সুগন্ধী মশলা বোঝাই জাহাজ। ঝকঝকে সোনালী রোদ্দুরের ছোঁয়ায় জেগে উঠল সারা দেশ।

শুধু মেঘ ঘনিয়ে রইল শাহজাদা শুজার অশান্ত মনে।

এখন আবহাওয়া অনুকূল। মক্কা যাত্রায় কোন বাধা থাকার কথা নয়। শুজার নির্দেশে আবার গেল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজের কাছে আর্জি জানাতে।

শান্ত এবং সমীহপূর্ণভাবে তরুণ দূতটি পিতার বক্তব্য জানিয়ে বলল, আবহাওয়া বড়ই অনুকূল, পিতার একান্ত ইচ্ছা তিনি সপরিবারে এই সময়টিতে মক্কা যাত্রা করেন।

মহারাজ এই প্রথম তরুণ দূতটিকে নিজের পাশের আসনে বসালেন।

অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে বললেন, আমি সব ব্যবস্থাই করে দেব, কেবল একটি শর্তে।

বলুন মহারাজ, কি সে শর্ত।

মহারাজ বললেন, আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজভাবে কথা বলতে ভালবাসি। আমার রানীরা তোমার ভগ্নীটির বড় ভক্ত হয়ে

উঠেছে। তারা তাকে কিছুতেই আরাকান থেকে যেতে দেবে না। সে থাকবে আমার রানীমহলে পূর্ণ রানীর মর্যাদায়।

এটা সম্ভব নয় মহারাজ।

কারণ?

আমার ভগ্নী বিবাহিত, তার স্বামীও বর্তমান।

হা হা করে হেসে উঠলেন মহারাজ। বললেন, এ খবর আমার অজানা নয় যে ওব স্বামী গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হয়ে আছে। আর একথাও সত্য যে এ জীবনে সেখান থেকে তার মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই।

তরুণ মাথা নীচু করল। সে ভেবেই পেল না এ গোপন খবরটি আরাকানপতি জানলেন কি করে। কিছুদিন আগে তারা আফরোজেব পাঠানো পারাবত মারফত গোয়ালিয়র দুর্গের বিস্মৃত খবর পেয়েছিল। আমিনার পিতার নিযুক্ত আরাকানী মানুষটি নির্দিষ্ট সংকেত স্থান থেকে ধরে এনে দিয়েছিল পারাবতটিকে। সেখান থেকে সংবাদটি কি তাহলে পাচার হয়ে পেঁৗছেছিল মহারাজের কানে! সে যাই হোক, এখন একটা কিছু উত্তর দিতে হয়।

তরুণ বলল, আমি আপনার অভিপ্রায়টি জানাব পিতার কাছে। তাঁর সম্মতি থাকলে আপনি অবিলম্বে খবর পেয়ে যাবেন!

শুজার কাছ থেকে কোন খবরই এল না রাজগৃহে। আরাকানের মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি গোপন আদেশ পাঠিয়ে নগর-বিপণি থেকে বন্ধ করে দিলেন শাহজাদা শুজার রসদ।

শুজা তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের সঙ্গে বসলেন শেষ পরামর্শে। তাঁদের চিন্তায় একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এরপর আরাকানের মহারাজের পদক্ষেপ হবে, শুজার সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন এবং সপরিবারে শুজাকে কারাগারে নিক্ষেপ। গুলরুখের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে বানী মহলে। কলঙ্কময় এক ঘূর্ণির আবর্তে কেটে যাবে তার সারাটা জীবন।

শাহজাদা বললেন, আমি আজ একান্ত অসহায় হয়ে পড়েছি বন্ধুগণ। আমার চিন্তা করার মত ক্ষমতা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। আমি জানি, আপনারা আমাকে অন্তর থেকে কতখানি ভালবাসা

দিয়েছেন। এতবড় দুঃখের আবর্তে পড়েও আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করে যাননি। এখন আপনারা যদি আত্মরক্ষার জন্য গুলরুখকে ঐ হিংস্র নেকড়ের মুখে তুলে দিতে চান, তাহলে আমি কিন্তু আপনাদের কোন বাধাই দেব না।

সমবেত পরামর্শদাতারা বললেন, কখনই নয়। এটি কেবল একটা শাদির প্রশ্ন নয়, এতে একটি জেনানার ইজ্জত জড়িত রয়েছে।

পরামর্শে কিন্তু অসম্ভব এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। আজই শেষ রাতে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে রাজপুরীর ওপর। অসতর্ক রক্ষীদের ঘায়েল করে মহারাজকে বন্দী করতে হবে। এই ভাবে চালাতে হবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। হয় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, নয়তো বাঁচার মত বাঁচা।

কিন্তু ভাগ্যের খেলা শুরু হল বিপরীত দিক থেকে।

শাহজাদা শুজা দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বেই দেখা গেল, সুউচ্চ রাজপুরী থেকে আঁকাবাঁকা পথে এক বিশালকায় অগ্নিনাগের মত মশালধারী সৈন্যেরা নেমে আসছে। ইতিমধ্যে কোন একজন গুপ্তচরের মাধ্যমে মহারাজ খবর পেয়ে গিয়ে শুজার বেয়াদবির উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য লেলিয়ে দিয়েছেন রাজ-সৈন্যদের।

শাহজাদা কাতর কণ্ঠে বললেন, এখন উপায়!

বিশ্বস্ত সেনাপতিরা একবাক্যে বলে উঠলেন, আপনি সপরিবারে অরণ্য চিরে, পর্বত ডিঙিয়ে দেশান্তরে পালাবার চেষ্টা করুন।

তোমরা আমার সঙ্গী হবে না? আমি একা পালাব? অসম্ভব। তোমাদের ত্যাগ করে কোথাও পালাতে পারব না।

আপনার অনেক নিমক খেয়েছি জাঁহাপনা। বিপদের মুখে যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন করার জন্য কিছু সময় এখানে লড়াই চালিয়ে ওদের আটকে রাখার চেষ্টা করে যাব।

একটি মাত্র ডুলিতে উঠে বসল বেগম আর তাঁর কন্যা গুলরুখ। অন্য সবাই অরণ্যের পথ ধরে অশ্বারোহণে পালাতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না। আরাকানী সৈন্যেরা শুজার

প্রতিরোধ বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে পরিচিত পথে মশালের আলোয় চলে এল শাহজাদা শুজার কাছে।

সামান্য প্রতিরোধ ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। শুজার পুত্রেরা বন্দী অবস্থায় ডুলির সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলল রাজপ্রাসাদে।

শাহজাদা শুজা একাই লড়তে লাগলেন কঙ্করময় সেই রাতের অরণ্যে। মাঝে মাঝে মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছিল একটা রক্তাক্ত মানুষকে উন্মত্তের মত তলোয়ার ঘুরিয়ে যেতে। দূর থেকে তখন তাঁর ওপর বৃষ্টির মত এসে পড়ছিল প্রস্তরখণ্ড। পাথরের ঘায়ে ক্ষিপ্ত ও অস্থির হয়ে শাহজাদার বিশ্বস্ত অশ্বটি সাময়িক বিভ্রান্ত হল কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই সে তার কর্তব্য স্থির করে নিল। তার প্রাণের মালিক শাহজাদাকে পিঠে নিয়ে সে গভীর অরণ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বিদ্যুৎ গতিতে অন্তর্হিত হল সবার দৃষ্টির অন্তরালে। যুদ্ধে পরাজিত প্রভুর প্রাণরক্ষার এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যটির সাক্ষী ছিল আর এক অশ্বারোহী। শাহজাদার অশ্বের খুরের শব্দকে অনুসরণ করে সেই অশ্বারোহী ছুটে চলল অন্ধকারের বুক চিরে। এক সময় অরণ্য পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পৌঁছল সেই অশ্বারোহী। চাঁদের আলোয় দূরে দৃশ্যমান হল সামনের দ্রুতগামী অশ্বের পিঠে শায়িত অচৈতন্য শাহজাদার দেহ। দেহটা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অশ্বের পিঠে একপাশে ঝুলে পড়েছে, সেইজন্য অশ্বের গতিও হয়েছে আগের তুলনায় অনেক মন্থর। বেশী দূর সে পিঠের ওপর ধরে রাখতে পারল না তার প্রভুকে। শাহজাদা শুজা ভূপৃষ্ঠে পতিত হলেন। অনুসরণকারী শাহজাদার কাছে পৌঁছেই চকিতে অশ্বের পিঠ থেকে নেমে তাঁর দেহটি নিজের কোলে তুলে নিল। চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে স্পষ্ট বোঝা গেল যে অশ্বারোহী একজন নারী। রহস্যময়ী সেই নারী শাহজাদার প্রাণের স্পন্দন নির্ধারণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর দেহে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে বুঝতে পারল যে শাহজাদা মৃতপ্রায় হলেও, তখনও পর্যন্ত জীবিত।

কাছেই একটা ছোট জলাশয় দেখা যাচ্ছিল। শুজার শুভাকাঙ্ক্ষী সেই নারী তাঁকে অতি সাবধানে কোল থেকে মাটিতে শুইয়ে অশ্বের

পিঠ থেকে একটি চামড়ার আধার সংগ্রহ করল। এরপর সে সেই জলাশয় থেকে চামড়ার আধারে ভরে নিল পর্যাপ্ত পরিমাণ জল। ফিরে এসে শাহজাদাকে আবার কোলের ওপর তুলে নিয়ে, তাঁর চোখে মুখে জল দিতে লাগল।

মুখ নাড়লেন শাহজাদা শুজা। অস্ফুট কি একটা বলবার চেষ্টা করলেন বোঝা গেল না। শাহজাদার মুখের ফাঁক দিয়ে জল ঢেলে দিতে লাগল মহীয়সী সেই নারী।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেললেন শুজা। ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, কম্পিত দুটি হাত প্রসারিত করলেন অশ্রুসিক্ত, আবেগরুদ্ধ একটি মুখের দিকে। 'মুখটি তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়ল, দুচারটি তপ্ত অশ্রুবিন্দু।

ঘোলাটে চোখ মেলে শাহজাদা চাঁদের আলোয় মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

কে তুমি? আ-ফ-রোজ! না, তুমি তো শুধু আফরোজ নও। দম নিলেন শুজা, বললেন, আরও একটু জল।

আফরোজ শাহাজাদার মুখে গভীর মমতায় জল দিতে থাকল। শুজার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যুপথযাত্রীর ম্লান এক টুকরো হাসি। আফরোজ শাহজাদার ওষ্ঠে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, মালেক. আফরোজ ছাড়া আর কাউকে এসময় মনে পড়ে কি?

ছায়ার মধ্যে আফরোজের মুখের দগ্ধ অংশটা অদৃশ্য হয়ে শুজার সামনে রেশমীর অক্ষত অনিন্দ্য মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শুজা দেখলেন, রেশমীর গলায় দুলছে তাঁর একান্ত ভালবাসার দান, সেই মুক্তাহার, যেটা আফরোজ সযতনে গোপন করে রেখে ছিল এতদিন।

আবেগরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে শাহজাদা বললেন, আল্লা এতদিন আমার রেশমীকে এতদূরে সরিয়ে রাখলেন কেন? তবু চলে যাওয়ার সময় তোমাকে আবার ফিরে পেলাম। আঃ খোদা! তুমি মেহেরবান।

রেশমী আকুল হয়ে বলল, মালেক, তুমি কোথাও যাবে না। তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

শুজা বললেন, আল্লার সে ইচ্ছা নয় রেশমী। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। তোমার কোলে মাথাটা এইভাবে রেখে আমাকে ঘুমুতে দাও।

রাত শেষ হয়ে এল। রেশমীর কোলেই চোখ বুজলেন ভাগ্যহারা, শাহজাদা।

রেশমী আশ্চর্য হল প্রকৃতির সৃষ্টি একটি গোরস্থান দেখে। পাথুরে মাটিতে তৈরী হয়েছে গভীর একটি ফাটল। তার পাশে পড়ে আছে স্তূপীকৃত নুড়ি পাথর।

এক মুহূর্তও সময় ছিল না শোকপ্রকাশের। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই চলে যেতে হবে তাকে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে।

রেশমী শাহজাদার দেহটিকে টেনে এনে সাবধানে নামিয়ে দিল পাহাড়ী ফাটলেব মধ্যে। তারপর ওপরে জমে থাকা নুড়ি পাথব ঠেলে ঠেলে ফেলতে লাগল তার ভেতর।

অনেকখানি ভরে উঠল ফাটলটা। এবার পাহাড়ী ঝর্ণায় আচমন করে এসে হাঁটু গেড়ে বসল কবরের কাছে।

খোদা, আমি ধর্মেব বিধি, আচার আচরণ কিছুই জানি না, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার সৃষ্ট এই পবিত্র দেহ শ্বাপদ আব শকুনিতে ছিন্নভিন্ন করবে এ আমি চাইনি। তাই তোমারই মাটির গোপন আশ্রয়ে দেহটি রেখে দিয়ে গেলাম, তুমি দেখো আল্লা।

শুকতারা জ্বল জ্বল করছিল ভোরের আকাশে। রেশমী অরণ্যের আড়ালে আড়ালে নেমে চলে গেল নগরীর দিকে।

তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল বিচার সভা। পৃথিবীর অন্যতম নৃশংস এক শাস্তির ফরমান ঘোষণা করছিলেন আরাকানের মহারাজ। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলছিলেন, যেহেতু আসামীরা তিন মাসেরও অধিককাল আরাকানের অন্নজল গ্রহণ করেছে, সেহেতু ঐ কমাস অভুক্ত অবস্থায় গৃহবন্দী থেকে তাদের কাটাতে হবে। তার পরও কেউ যদি বেঁচে থাকে পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করার জন্য তাহলে তাকে অবশ্যই মুক্তি দেওয়া হবে।

মহারাজের পাশে বসেছিলেন রাজ্যের প্রধান বিচারক। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, মহারাজ কৃপাময়, তিনি বন্দীদের জল পান থেকে বঞ্চিত করেন নি।

ঘোষণা শেষ হলে সমস্ত আরাকানীরা উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

নিঃশব্দে বোরখায় মুখ ঢেকে প্রাসাদে প্রবেশ করল রেশমী। রক্ষীরা তখন শিথিলভাবে প্রহরায় নিযুক্ত। তারা রাতের ঘটনা নিয়ে নিজেদের ভেতর মশগুল হয়েছিল আলোচনায়।

রেশমী প্রাসাদের বাইরে একটি দাসীর মুখ থেকে শুনেছিল, গুলরুখকে মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন মহারানীর এজলাসে।

রেশমী পাঁচটি তোরণ পার হয়ে ঢুকল রানীমহলে। সে দেখতে পেল, রানীরা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বসে আলোচনায় মত্ত হয়েছে। সব আলোচনাই রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

তারা আলোচনায় এমনই মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে রেশমীকে লক্ষ্যই করল না। রেশমী সোজা ঢুকে গেল মহারানীর প্রকোষ্ঠে।

মহারানী তখন বসেছিলেন তাঁর বহু মূল্যবান পালঙ্কখানির ওপর! পালঙ্কের নীচে একখানি আসনে উদ্ভ্রান্তের মত বসেছিল গুলরুখ। মহারানী তাকে কিছু বোঝানর চেষ্টা করছিলেন।

রেশমী ঘরের ভেতর ঢুকে মহারানীকে আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানাল।

মহারানী রেশমীর প্রণামের ঘটায় কিছুটা প্রসন্ন হলেন। মুখে বললেন, দেখ আফরোজ, আমি গুলরুখ বানুকে এত করে বোঝাচ্ছি, ও কিন্তু একটুও সাড়া দিচ্ছে না। আমি বললে মহারাজ ওকে ক্ষমা করে দেবেন। কেবল ক্ষমা নয়, রানীমহলে ওর বিশেষ একটা স্থানও হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ও বুঝতে পারছে না, মহারাজ একবার ক্রুদ্ধ হলে ওর আর নিস্তার নেই। সলিল সমাধিও ঘটে যেতে পারে।

রেশমী বলল, ও আপনার ভাষা সঠিক হয়ত বুঝে উঠতে পারছে না, তাই বিপত্তি। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছি মহারানী।

আরাকানের মহারানীর মুখে এতক্ষণে প্রসন্নতার একটা ছবি ফুটে উঠল। কিছু আগে মহারাজ গুলরুখ বানুকে মহারানীর এজলাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে পাঠিয়েছেন,

মহারানী যেন অবশ্যই নতুন বুলবুলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মহারাজের রানীবাগে রাখবার ব্যবস্থা করেন।

রেশমী এবার গুলরুখের দিকে তাকাল। গুলরুখের বড় বড় চোখ অমনি ভরে উঠল জলে।

রেশমী বলল, এখন আমাদের শক্ত হতে হবে গুলরুখ। নিজেদের শক্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হবার সময় এসে গেছে।

ওদের কিছু খবর জান তুমি?

এই পরিস্থিতিতে অসত্য বলে কোন লাভ নেই গুলরুখ। তোমার আব্বাজান শত্রু ধ্বংস করতে করতে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি নিজের হাতে তাঁর যথাসাধ্য সদ্গতি করেছি।

গুলরুখের চোখ বেয়ে বড় বড় দুটো মুক্তোর দানা গড়িয়ে পড়ল।

আমার আম্মাজান আর ভাইবোনেরা কোথায় আছে এখন? কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল গুলরুখ।

আরও শক্ত হতে হবে তোমাকে সোনা, মানিক। তাঁদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে।

চীৎকার করে কাঁদল না গুলরুখ, কেবল মাথাটা ঝুঁকে পড়ল তার বুকের কাছে।

ভেবে দেখ গুলরুখ, তুমি একবার মাত্র রানীমহলে প্রবেশের সম্মতি দিলেই এতগুলো মূল্যবান প্রাণ বেঁচে যেত। কিন্তু তোমার আব্বাজান থেকে সমস্ত পরিজনই তোমার ইজ্জৎ রক্ষার জন্য জান কুরবাণি দিলেন। এবার নিজের পথ বেছে নেবার দায়িত্ব তোমার।

মাথাটা সোজা হল গুলরুখের। চোখে ফুটে উঠল আগুনের দীপ্তি। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। প্রাণ থাকতে রানীমহলে প্রবেশ করব না।

রেশমী বলল, আমিও তোমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় তোমারই পথের পথিক হব গুলরুখ। তবে মৃত্যুর আগে কয়েকটা দিন একসঙ্গে আমরা কাটাতে চাই। মহারাজের কাছে মিথ্যে অভিনয় করে এ দিনগুলি আমি চেয়ে নেব।

গুলরুখ বলল, যে মৃত্যুকে বরণ করতেই হবে তাকে মিথ্যে কটা দিনের মোহে ঠেকিয়ে রাখা কেন?

আমার কথা শোন গুলরুখ, যে ভাগ্যহীন যুবক দাক্ষিণাত্য থেকে পারাবত পাঠিয়ে প্রায় প্রতি পক্ষকালে তোমার সংবাদ নিয়েছে, যে তোমার প্রেমের টানে ভেসে আসার জন্য গোয়ালিয়র দুর্গে সারা জীবনের মত নির্বাসিত হয়েছে, তাকে তুমি শেষ চিঠি লিখবে না ? যদি সম্ভব হয় উত্তরের প্রতীক্ষা করবে না ?

গুলরুখ বলল, গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হবার পর তোমার পাঠানো পারাবতের পাখায় সে পাঠিয়েছে তার ভালবাসার কত লিপি। কোনটিতে পাখির গান, কোনটিতে গোলাপের গন্ধ, কোথাও ইন্দ্রধনুর রঙের ছোঁয়া, আবার কোথাও বা প্রজাপতির প্রাণ মাতানো নৃত্যের স্পর্শ ছিল। হ্যাঁ, আমি তাকে লিখব আমার শেষ চিঠি। তুমি কটা দিনের জন্য রদ করে দাও মৃত্যু-দণ্ডটাকে।

রেশমী বলল, মহারানী, পক্ষকালের জন্য প্রাসাদের বাইরে কোথাও আমাদের থাকার একটু ব্যবস্থা করে দিন। আমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রানীমহলে পাঠাবার চেষ্টা করব। কয়েকজন দাসীকেও দিয়ে দিতে পারেন ওর সেবার জন্য।

মহারানী খুশী হয়ে উঠলেন বলে মনে হল। তিনি বললেন, এই টিলার নীচে নদীর ধারে রাজবাড়ীর অতিথি-ভবন। সেখানে দু'চারজন দাসী নিয়ে নিশ্চিন্তে কদিন থাকতে পার। আমি মহারাজকে বলে সময় চেয়ে নেব।

চিঠি পাঠাল গুলরুখ। প্রেমিকের কাছে, স্বামীর কাছে তার শেষ চিঠি। অতি ক্ষুদ্র, পাখির পাখায় বাহনের যোগ্য কিন্তু প্রতি ছত্রে লেগে আছে শিশিরের ছোঁয়া।

তোমার ছোঁয়ায় আমি ফুল হয়ে ফুটেছিলাম,
ঝরে যাচ্ছি নতুন করে ফুটব বলে।
তোমার স্বপ্নে আমি মেঘ হয়ে ভেসেছিলাম,
ঝরে যাচ্ছি মেঘ হয়ে ফিরব বলে।
তুমি আমার ফুলের সুবাস,
তুমি আমার মেঘের ইন্দ্রধনু,
মেঘ ঝরে গিয়েও হারাবে না,
ফুল ঝরে গিয়েও শুকোবে না,

তুমি আমাকে ওদেরই ভেতর খুঁজে দেখো।

চিঠি চলে গেল, কিন্তু পক্ষকাল পার হয়ে গেলেও পারাবত ফিরে এল না।

দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর মহারাজ ক্ষুব্ধ হয়ে মৃত্যুদণ্ডই মঞ্জুর করলেন। কিন্তু করুণা করে বললেন, আমি তোমাকে রানীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম, তাই সাধারণ মৃত্যু তোমার জন্যে নয়। তুমি আমার সুসজ্জিত বজরাতে বিহার করতে করতে বজরাসহ নদীর বুকে সলিল-সমাধি লাভ করবে। এ মৃত্যু হবে অনেক বেশী মর্যাদার।

তাই হল। নদীর বুকে ভাসল ছিদ্রযুক্ত বজরা। আকাশ নীলকান্ত মণির মত নীল। পূর্ণিমার রূপালী জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছিল স্বর্গীয় রজত পাত্র থেকে।

হঠাৎ গুলরুখের মনে হল, নদীটি বিশাল একটা হ্রদ হয়ে গেছে। সেই হ্রদের দর্পণে ছায়া ফেলেছে তীরের তুষার মুকুট পরা পর্বত।

একটি চিত্রিত নৌকোর ওপর সে যেন বসে আছে সুলতান মুহাম্মদের বুকে মাথা রেখে।

মুহাম্মদ তাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভাষায় বলছে,—'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে সে এইখানে, সে এইখানে, সে এইখানে।'

ভোরের সোনালী সূর্যের নরম হলুদ আলো এসে স্পর্শ করল প্রায় ডুবন্ত বজরাখানির মাস্তুল।

সহসা একটা পারাবত উড়ে এসে ঘুরতে লাগল মাস্তুলের চতুর্দিকে। এ পারাবত মহাকালের যাত্রী। এর পাখায় বাঁধা একখানি লিপি, যুগযুগান্তরের প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসে ভরা।

'জাতা হুঁ দাগ্-এ হসরৎ-এ হস্তী লিয়ে হুয়ে,
হুঁ শমা-এ কুশ্ তহ্ দরখুর-এ মহ্ফিল নহীঁ রহা॥' ।

জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এক নির্বাপিত প্রদীপ আমি, মহফিলে রাখার যোগ্য নই আর।

—